উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

মার্চ ২০২১। মূল্য ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

একুশের ডাক

আদিবাসীদের সারনা পৃথক ধর্মের স্বীকৃতির জন্য সোচ্চার কেন?

আমাদের ভবিষ্যৎ কি তালিবান?

জনসংখ্যায় সমান তবু মর্যাদায় পিছিয়ে এদেশের নারী

সেদিনের সম্পন্ন জলপাইগুড়ি আজ কেন বিপন্ন?

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

বন্ধুদের অপেক্ষায় ভালোবাসার বইঘর

প্রকাশিত হল

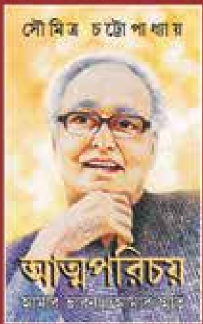

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মপরিচয় 395/-

'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ রুচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার

সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে

হায় সজনি

চূড়ান্ত রোমান্টিক উপন্যাস 199/-

এখনও যেসব বই বেস্টসেলার!

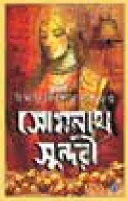

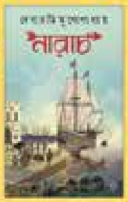

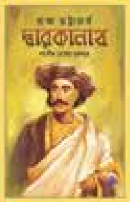

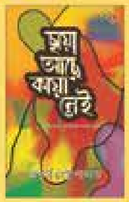

সুন্দরী সিরিজের শ্রেষ্ঠ বই! ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত **সোমনাথ সুন্দরী** 395/-

উনবিংশ শতাব্দীর মর্মস্পর্শী দলিল! অন্ধকারে আলোর মশাল

দেবারতি মুখোপাধ্যায় **নারাচ** 385/-

তিনি ছাড়া ঠাকুর পরিবার শিকড়হীন! পরাধীন দেশের রাজপুত্র

রাজা ভট্টাচার্য **দ্বারকানাথ** 349/-

তন্ত্র-অলৌকিক-অপবিজ্ঞানের গায়ে কাঁটা দেওয়া বই

অভীক সরকার **পেতবখু** 199/-

অন্যজগতের অতিথিদের অব্যক্ত কথা!

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় **ছায়া আছে কায়া নেই** 249/-

বইসাঁকোর নতুন বই

হুমায়ূন আহমেদ

নন্দিত নরকে 120/-

শঙ্খনীল কারাগার 135/-

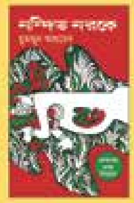

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোপন প্রেম 175/-

মৃত্যুকে আমি দেখেছি 199/-

শেষ ছোবল 160/-

ষোলোজনের কলমে ভয়াল ভূতুড়ে উপন্যাস ভূমিকা অনীশ দেব

প্রকাশ আসন্ন

পানিঝোরা কটেজ

পত্রভারতী 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 700 009 ফোন 22411175, 9433075550

বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি

নতুন বই ও ক্যাটালগের জন্য bookspatrabharati.com

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান: ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, **হোম ডেলিভারি** ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

এখন ডুয়ার্স

সপ্তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০২১

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

বিন্যাস
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদকীয় দপ্তর সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

প্রচ্ছদ গৌতমেন্দু রায়

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের চিঠি ২

বিশেষ প্রতিবেদন
সেদিনের সম্পন্ন জলপাইগুড়ি থেকে আজকের বিপন্ন জলপাইগুড়ি ৩

একুশের রাজনীতি
কেন আজ আদিবাসী ‘সারনা’ পৃথক ধর্মের স্বীকৃতি চায়? ১১
আমাদের ভবিষ্যৎ কি তালিবান? নাকি ‘টাইম মেশিনে’র জেলির তাল? ১৪

কভার স্টোরি
জনসংখ্যায় ও খাদ্য উৎপাদনে এদেশে নারীরা পুরুষের সমান হলেও অর্থনৈতিক অধিকার ও মর্যাদায় পিছিয়ে ১৮

রাজনগরের রাজনীতি
৭৭-এ ক্ষমতায় এসেই গাঁয়েগঞ্জে সিপিএমের নৃশংসতা কোচবিহারে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল ২০

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি ২৪

মুর্শিদাবাদ মেইল
বাংলা ভাষার বীর ভূমি এপারের গ্রাম বাবলা ২৮

এ ডুয়ার্স কি তোমার চেনা? মালবাজার ৩০

পর্যটন
মঙ্গরজঙ্গের দিনরাত্রি ৩৬, শীতের একবেলা চালসা পোলো ক্লাবে ৪০, ডুয়ার্স ডে আউট। দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট ৪৪

ধারাবাহিক উপন্যাস। ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৪৮
অলৌকিক কাহিনি। তন্ত্র ৫৫
গল্প আমার এ পথ... ৬০
আমচরিত কথা। সেই আজব মনের মানুষগুলি ৬৪
আমাদের বইপত্র। রোবনামচা ৬৮
ডুয়ার্স ইত্যাদি। হরেক মাল দশ টাকা ৮০

শ্রীমতি ডুয়ার্স
বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ভারতীয় নারী। কমল রানাডিভে ৭১
প্রবাসী কন্যার মেয়েবেলা ৭৬
পুরাণের নারী কৈকেয়ী ৭৮, পাতাবাহার ৮০

ঘণ্টা বাজিয়াছে ফের বাংলার দুর্ভাগ্যাকাশে

বেশ কয়েক বছর পূর্বে কলকাতার ব্রিগেড (যাহাকে মুখ ফসকাইয়া কেউ কেউ বিগ্রেডও বলিয়া থাকেন) ময়দানে এক বিশাল ঘণ্টা বানাইয়া ঝোলানো হইয়াছিল, যাহার মাধ্যমে তৎকালীন মহাপরাক্রমশালী শাসকের শেষ ঘণ্টা বাজাইবার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছিল। যদিও তাহার পরেও বহুদিন সেই শাসক বহাল তবিয়তে বাংলার মসনদে রাজ করিয়াছেন এবং অতঃপর একদিন নিজেদের ঘণ্টা নিজেরা বাজাইয়া চিরতরে প্রস্থান করিয়াছেন। উহাদের পৌত্র পৌত্রীরা এখনও রাজবংশের হতভাগ্য উত্তরাধিকারীদের মত কোথাও কোথাও গিটার বাজাইয়া 'একদিন না হয় একদিন' ফিরিয়া আসিবার গান গাহিয়া রোমাঞ্চিত হন। দার্জিলিং-এর প্রাচীন চা বাংলোগুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলে যেমন রোমাঞ্চ অনুভব হয়, অনেকটা সেইরকম।

সে যাহাই হউক, এইবার ঘণ্টা বাজাইয়াছেন প্রজাতন্ত্রের অন্যতম নিয়ামক নির্বাচন কমিশন, যাও গিয়া প্রস্তুত হও। পাঁচ বছরে একবার নিজেদের বিচ্ছিরি সব মার্কশিট হাতে লইয়া অশিক্ষিত আধন্যাংটো আধবোদ্ধা মানুষগুলির সামনে গিয়া খাড়া হও। দ্যাখো উহাদের মন কোনওভাবে গলাইতে পার কিনা। না পারিলে পিছে যাও, আর পারিলে আগামী পাঁচ বছর সরকার বা সাধারণ মানুষের কোষাগারের পাসওয়ার্ড তোমার হাতেই থাকিবে।

সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে এইবার বাংলায় গত সত্তর বছরের ইতিহাসে প্রথম ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে—যে জাতীয় দলটির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করিয়া এতদিন আঞ্চলিক শক্তিগুলি এ রাজ্যে শাসন-শোষণ যন্ত্র চালাইতেছিল, দীর্ঘকালের নেতৃত্ব ও নীতিহীনতায় সেই ঐতিহ্যবাহী দলটির প্রায় দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই দলে দুই মহাকৃতী বঙ্গতনয় সুভাষ ও শ্যামাপ্রসাদ প্রথম হইতেই ব্রাত্য, দেওয়ালে গান্ধী ও নেহরুর ছবি টাঙাইলেও তাঁহাদের ভাবনা হইতে সহস্র যোজন তফাত রাখিয়া এই দলে আসলে নেহরুর উত্তরাধিকারী হইবার সুযোগ লইয়া নকল গান্ধীরা দেশ চালাইতেছিল। কিন্তু একদিন উহাদের নকল ময়ূরপুচ্ছ জনগণের চোখে ধরা পড়িয়া যায়।

ফলত গত দুই দশকে অন্য যে জাতীয় দলটি অতি দ্রুতগতিতে উঠিয়া আসিয়াছে এবং দেশের এক বিশাল অংশ করায়ত্ত করিয়াছে, তাহারা এতদিন বাংলার মননে চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু গত পঞ্চান্ন বছরের সম্মিলিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শাসনে বাংলার আপাদমস্তক রাজনীতিকরণ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি যে এই রাজ্যে মায়ের ভোগে চলিয়া গিয়াছে তাহা আজ অস্বীকার করিবেন কে? ইহাতে দেশের মানুষের কাছে তো বটেই সারা বিশ্বে ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা আপামর বঙ্গসমাজের কাছে যে বাংলার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে ইহা লইয়া কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

অন্যদিকে এতদিন পিছাইয়া থাকা প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সেই 'অস্পৃশ্য' দলটিকে সমর্থন জানাইয়া সমৃদ্ধির পথে বেশ কয়েক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে, এবং সেই সব সরকারে কোনও 'সাম্প্রদায়িক' গন্ধ নাই ইহা বাংলার মানুষ সম্ভবত টের পাইয়াছে। স্বভাবতই সেই দলটি গত কয়েক বছরে প্রধান বিকল্প হিসাবে খাড়া হওয়ায় বাকিদের টিকি খাড়া হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সাইনবোর্ডধারী যাহারা গতবার তখত দখলের মিছা খোয়াব দেখিয়াছিল এইবার তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। সব মিলিয়া জমজমাট যাত্রামঞ্চ প্রস্তুত, পালা শুরু হওয়ার অপেক্ষায়। দুর্ভাগা বাংলা আবার প্রত্যক্ষ করিবে নতুন আখ্যান।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

বিশেষ প্রতিবেদন

সেদিনের সম্পন্ন জলপাইগুড়ি থেকে আজকের বিপন্ন জলপাইগুড়ি

রণজিৎ কুমার মিত্র

১৮৬৯-২০২০, একশ একান্ন বছর অতিক্রান্ত জলপাইগুড়ি, নানা সংকটে সমস্যার ঘূর্ণিপাকে বিব্রত; অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাস গত নাম ছিল বৈকুণ্ঠপুর। ১৭৭৩ সালে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠপুর কোম্পানীর করদ রাজ্যে পরিণত হলে বৈকুণ্ঠপুর সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হয়। বৈকুণ্ঠপুরের রাজা জয়ন্তদেব আনুমানিক ১৭৯৩-১৮০০ সালের কোনও এক সময়ে তাঁর রাজ্যপাট 'বৈকুণ্ঠপুর' নামক স্থান থেকে সরিয়ে এনে জলপাইগুড়িতে স্থাপন করেন। বর্তমান জলপাইগুড়ি তখন জলপাইগুড়ি বলে এলাকাটি ফকিরাগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। সেই সময় জলপাইগুড়ি ছিল গঞ্জর মত। ১৮৪৯ সালে হুকার সাহেব জলপাইগুড়িকে উল্লেখ করেছিলেন— 'ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহৎ গ্রাম' (Large straggling village)। ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি শহর গড়ে উঠবার প্রধান কারণ ছিল ইংরেজদের সেনানিবাস তৈরি করা। ১৮৭৬ সালে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিনিধি, ডবলিউ ডবলিউ হান্টারের চোখে জলপাইগুড়ি ছিল 'consideralbe town'।

জলপাইগুড়ির ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি চর্চার দুই প্রধান পুরোধা চারুচন্দ্র সান্যাল ও রেবতী মোহন লাহিড়ি লিখেছিলেন— "এই জলপাইগুড়ি জনপদ যখন গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন ইহার সম্ভাবনাপূর্ণ দুর্গম অরণ্য অঞ্চল বাংলার Eldorado— হাতছানি দিয়া যেমন অসংখ্য ভাগ্যান্বেষীকে আহ্বান করিয়াছিল নূতন ভাগ্য গড়িবার জন্য তেমনি দেশবিভাগের পরে বাঙ্গালী জাতির এক বেদনাময় মুহূর্তে আবার অসংখ্য গৃহচ্যুত ছাত্র, শিক্ষক ও গৃহস্থকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিল এই জেলাই— নূতন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। এই জলপাইগুড়ি হইয়াছিল। আবার এই জলপাইগুড়ি শহরেই এক মহাসভায় সর্বপ্রথম ইংরেজকে 'ভারত ছাড়ার' নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আবার এই জলপাইগুড়ি শহরেই এক মহাসভায় বঙ্গবিভাগের প্রসার গৃহীত হইয়াছিল। যে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার আগমণে জলপাইগুড়ির জনপদ এবং শহর নব কলেবর ধারণ করিয়াছে।"

এই নবগঠিত জলপাইগুড়ির অর্থনীতি প্রায় একশ বছর ধরে ছিল চা-কেন্দ্রিক। চা-শিল্পকে ঘিরেই জলপাইগুড়ি জেলার ছোট ছোট শহর মালবাজার,

বীরপাড়া, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা-র উত্থান। নবগঠিত জেলায় পঁচাত্তর বছরেরও বেশি ইংরেজ শাসনকাল ছিল জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠনের কাল। টি, টোবাকো, টিম্বার-এর রমরমা ব্যবসার কাল, কারা কত বেশি মুনাফা করতে পারে। ইংরেজরা তো ছিলেনই তাদের সাথে ছিলেন ইংরেজদেরই খয়ের খাঁ-রা। পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ির মত এত বেশি রায়বাহাদুর ও খানবাহাদুর বোধহয় অন্য জেলাতে আর নেই।

ইংরেজরা যা পারে, ভারতীয়রাও তা ভালভাবে করতে পারে তার প্রমাণ রেখেছিলেন জলপাইগুড়ির সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা একের পর এক চা-বাগান খুলে। জয়চন্দ্র সান্যাল, গোপাল ঘোষ, তারিণী রায়, রহিম বক্স-রা জলপাইগুড়ির অর্থনীতিকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন সে সব আজ ইতিহাস। ভারতীয় চা-শিল্প প্রবর্তনের প্রথম পথিকৃতরা 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম' এই জলপাইগুড়ি শহরেই থাকতেন। দেশভাগের পর শুধু পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষেরাই নন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভগ্যান্বেষীরা 'বাংলার এল ডোরাডো' জলপাইগুড়িতে আসতেন। দুটো বিমানবন্দর ছিল পাঙ্গা ও আমবাড়ি। দার্জিলিং মেল, মেডিকেল স্কুল কত কি! ঝকঝকে সুসজ্জিত স্টেশন, দার্জিলিং মেল ভোরবেলায় এসে থামত, ছিল 'সোরাবজির চায়ের দোকান'। সাদা পোশাক ও কারুকাজ করা টুপি মাথায় সোরাবজির চায়ের দোকানের কর্মীরা চায়ের ট্রে হাতে যাত্রীদের চা দিয়ে যেতেন। প্রতি বছর শীতকালে কলকাতার বিখ্যাত সব দোকানের মাল নিয়ে একটি ট্রেন আসত জলপাইগুড়ি স্টেশনে। দু'তিন দিন স্টেশনে থাকত সেই ট্রেন। সেই সব জিনিসপত্র কেনার লোকের অভাব জলপাইগুড়িতে ছিল না। জেলার সমস্ত বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুলের যোগদানে 'যোগেশচন্দ্র মেমোরিয়াল স্পোর্টস ছিল শীতকালের সাড়া জাগানো উৎসব। শীতে উচ্চাঙ্গসংগীতের আসরে কে আসেনি, বড়ে গোলাম আলি, আলি আকবার খাঁ, রবিশঙ্কর, মণিলাল নাগ, ভি জি যোগ, সুনন্দা পট্টনায়ক। হেমন্ত-সন্ধ্যা-মান্না-প্রতিমা-আরতি সকল শিল্পীর প্রিয় ছিল জলপাইগুড়ি। টাউন ক্লাবে সন্তোষ মেমোরিয়াল শীল্ড। কদমতলা পাটগোলায় বা আর্যনাট্য প্রাঙ্গণে কলকাতার বিখ্যাত নট্টকোম্পানীরা। শহরবাসীর বিনোদনের জন্য, সংস্কৃতির মান উন্নয়নের জন্য চা-কররা পয়সা খরচ করতে কখনও পিছু পা হতেন না। জলপাইগুড়ির স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গড়ে তোলার পেছনে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে চা-করদের বেসরকারী উদ্যোগই ছিল বেশি। কিন্তু চা-শিল্পের মন্দায়, ১৯৬৮-র বিধ্বংসী বন্যায়, বিভাগীয় সদর শহর হওয়া সত্বেও, জলপাইগুড়ি হতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল, জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছিল— 'অবরোধ প্রতিরোধ কমিটি'। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটির (এসজেডিএ) বদলে দাবী জানানো হয়েছিল স্বতন্ত্র জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটির। সম্পন্ন জলপাইগুড়ি পরিণত হয়েছিল বিপন্ন অবস্থায়।

জলপাইগুড়ির চা কেন্দ্রিক অর্থনীতি সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে গেছে দীর্ঘকাল। শহরের বাঙালি চা করেরা আর ধরে রাখতে পারলেন না তাদের পূর্ব পুরুষদের পরিশ্রমে গড়া চা-বাগানগুলিকে। বহু বাগান বিক্রী, হস্তান্তরিত হল। বর্তমান চা-বাগানের মালিকরা তাদের লভ্যাংশের সামান্যও কোনও উন্নয়নে খরচ করেন না। বহু চা-বাগান মালিকদের পরিত্যক্ত, বন্ধ, লক আউট ক্লোজারে জরাজীর্ণ চায়ের মানও নেমে গেছে। ডুয়ার্সের চায়ের স্বতন্ত্র কোনও ব্র্যান্ড হল না। জেলায় যেসব বটলিফ ফ্যাক্টরি হয়েছে, সেগুলির সরকারি অনুমোদন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠছে। ক্ষুদ্র চা-চাষিরা যথার্থ দামও পাচ্ছে না। শ্রমিক অসন্তোষও তীব্র। জলপাইগুড়ির চা নীলাম কেন্দ্রটিও মৃতপ্রায়। একে বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদদের অভিমত ছিল, শুধু চা-শিল্পের উপর নির্ভর করে জলপাইগুড়ির অর্থনীতিতে আর নতুন জোয়ার আসবে না, বর্তমানের প্রয়োজনে চাই 'বৈচিত্র্য' বা 'ডাইভারসিফিকেশন'। জলপাইগুড়ি জেলায় নতুন শিল্প গড়ার জন্য 'উত্তরবঙ্গ জাতীয় বণিকসভা' প্ল্যানিং কমিশনের কাছে 'স্পেশাল ইকনমিক জোন'-এর স্ট্যাটাস চেয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ মানস দাশগুপ্ত লিখেছিলেন— "জলপাইগুড়ির সামনে এখন

বিরাট সম্ভাবনা... জলপাইগুড়ির বহু অঞ্চলে পাম অয়েল শিল্প প্রতিষ্ঠা করে চাষিরা লাভবান হতে পারে। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বায়ো-ডাইভার্সিটি যা পৃথিবীর অঞ্চলের ইর্ষার পাত্র হতে পারে। পেটেন্ট রাইট অবলম্বন করে স্থানীয় উদ্যোগপতিরা যদি জলপাইগুড়িতে বৈচিত্র্যময় শিল্প— বিশেষত ওষুধ শিল্প গড়ে তুলতে পারে, তবে আকাশ ছোঁয়া সম্ভাবনা। ...কাঁচা মালের অভাব এখানে নেই। শিল্প এখন জ্ঞানভিত্তিক (বা নলেজ বেসড) সেই জ্ঞানেরও অভাব নেই কারণ জলপাইগুড়ির স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা অন্তত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। দরকার সবার মধ্যে মেলবন্ধন।"

ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্ব জলপাইগুড়ির বড় সমস্যা। এ জেলার পরিযায়ী শ্রমিক সংখ্যা কত তার কোনও সঠিক পরিসংখ্যান নেই। বহু চা-বাগান বন্ধ, শুধু চা-শ্রমিক রাই নয়, কৃষি শ্রমিকরাও কাজ না পেয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। এক সময়ে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। ইউরোপীয় চা-মালিকেরা তাদের হেড অফিস কলকাতায় স্থাপন করলেও দেশীয় চা-শিল্পের মালিকেরা তাদের সদর দপ্তর জলপাইগুড়ি জেলা শহরেই স্থাপন করেছিল। শহরের যুব সমাজের একটা বড় অংশের বিভিন্ন চা-বাগানগুলিতে ও চা-বাগানের মালিকদের আত্মীয় পরিজন ও পরিচিতদের চা-বাগানের হেড অফিসে চাকরির সুযোগ ঘটত। বর্তমানে ছবিটা হেড অফিসের একটিও আজ আর নেই। শিল্পবিহীন জলপাইগুড়িতে চাকরি বা জীবিকা সংস্থানের জন্য তেমন কোনও সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না।

সমৃদ্ধ অর্থনীতির জন্য চাই বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক ঋণ। বন্যাপ্রবণ, সীমান্তঘেরা জেলা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিনিয়োগকারীদের উৎসাহী করে না, এ জেলায় বিনিয়োগের জন্য। এক সময় চা, তামাক, পাট শিল্পের জন্য জলপাইগুড়িতে বেসরকারি উদ্যোগে কতগুলি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ট্রেডিং করপোরেশন, বেঙ্গল ডুয়ার্স ব্যাঙ্ক, জোতদার ব্যাঙ্ক, আর্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রাহুত ব্যাঙ্ক লিমিটেড। এসবের আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই। অনেক সীমাবদ্ধতাও ছিল জলপাইগুড়ি জেলার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার। কিন্তু স্বাধীনতার পর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর এই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে, ব্যবসা চালাবার জন্য ঋণদানে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নি। আবার বহু ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহীতার অসাধুতা ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাব ব্যবসা ক্ষেত্রে হতাশা সৃষ্টি করেছে। নতুন করে বাজার ও তেমন তৈরি হয় নি। চা নীলাম কেন্দ্রটিও অতলে তলিয়ে গেল।

১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি শহরে নাগরিক প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল একাধিক স্কুল, কলেজ। আজ অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির করুণ অবস্থা। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার স্থান সবার নীচে। শহরে স্নাতক ডিগ্রির আরেকটি কলেজ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলেও, জলপাইগুড়িতে হয় নি। গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। ফার্মেসী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেরও বেহাল অবস্থা।

শহরে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি ছিল নগণ্য। জেলার ৯৮ শতাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবি, তাদের শহরে বাস করবার আগ্রহ তেমন ছিল না। দেশবিভাগের পর জলপাইগুড়িতে 'মানুষের বন্যা এসে গেল'। ১৯৭০ এর পর থেকে গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা ক্রমাগত বাড়তে লাগল। কৃষি জমিতে বাড়িঘর উঠছে। উদ্বাস্তু আর অনুপ্রবেশকারী, জেলার বড় সমস্যা। শহরে পথঘাটের সংকীর্ণতা, অপরিকল্পিত ভাবে বহুতল, ফ্ল্যাট, শপিং মল তৈরি হয়েছে। বাজারগুলিরও আধুনিকীকরণ হয় নি। একশ পঁচিশ

বছরের ঐতিহ্যবাহী পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হওয়ার স্বপ্ন আর সাকার হল না। পৌরপরিসেবাও অপ্রতুল, একটু বৃষ্টি হলেই শহরের বহু ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে যায়। যানজটে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত।

জলপাইগুড়ি শহরে নাগরিক প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল একাধিক স্কুল, কলেজ। আজ অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির করুণ অবস্থা। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার স্থান সবার নীচে। শহরে স্নাতক ডিগ্রির আরেকটি কলেজ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলেও, জলপাইগুড়িতে হয় নি। গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। ফার্মেসী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেরও বেহাল অবস্থা। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের কথা মাঝে মাঝে শোনা গেলেও তা বাস্তবায়িত করবার কোনও উদ্যোগ তৈরি হয় নি।

১৯৪৮ সালে জলপাইগুড়িতে বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র সান্যাল, সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়, রামচন্দ্র বাজারিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছিল 'উত্তরবঙ্গ জাতীয় বণিকসভা' (নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস)। জলপাইগুড়ির তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-যোগাযোগ-পরিবহণ সমস্ত দিকের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে তারা প্রস্তাব দিয়েছেন, প্রয়োজনে আন্দোলনে পথে নেমেছেন রামচন্দ্র বাজারিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চ্যাংরাবান্দা-মাথাভাঙা-কোচবিহার-তুফানগঞ্জ থেকে ধুবড়ি জেলার মধ্য দিয়ে যোগীখেপা পর্যন্ত বিকল্প রেললাইনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান উপেন্দ্রনাথ বমর্ণের চেষ্টায় সার্ভের কাজও হয়েছিল। পামতেল উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্রর জন্য এই বণিকসভা বারবার আবেদন করেও সরকারি সহযোগিতা পায় নি। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি যাতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দাঁড়ায় তার জন্য বহুবার আন্দোলনে নেমেছে। তিনবিঘা হস্তান্তরের সময় তেঁতুলিয়া করিডোরের দাবী করা হয়েছিল, এতে চোপড়া থেকে জলপাইগুড়ির তিস্তা ব্রিজের দূরত্ব কমে যেত ৮৩ কিলোমিটার।

জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে বহু বার বহু প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেছিল, সে সব নথিপত্র উত্তরবঙ্গ জাতীয় বণিক সভার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী সমরেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাসের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। তার কাছ থেকেই শুনেছি ময়নাগুড়ির ছেলে পি এন আগরওয়ালা পামতেল উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারি সহযোগিতা চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখাত হন, পরে শ্রী আগরওয়ালা তার প্রকল্পটি মালয়েশিয়াতে নিয়ে যান। সেখানে তিনি একজন বিখ্যাত পামতেল উৎপাদক ও রপ্তানিকারক। শ্রী সমরেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস ও উত্তরবঙ্গ জাতীয় বণিকসভার সদস্যরা, ১৯৮২ সাল থেকে মোহিতনগর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পাম ওয়েল' গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তখন ছিলেন বলরাম জাখর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারে তখন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ। জলপাইগুড়িতে মন্ত্রী ও বিধায়ক নির্মল বসুকে উত্তরবঙ্গ জাতীয় বণিকসভা ফাইল এবং প্রোজেক্ট রিপোর্ট দিলে— 'বিজেপি অ্যাওয়েটিং ফর পাওয়ার' এই অজুহাত দেখিয়ে ফাইল ফেরৎ দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে না আসাতে নরসিমা রাও অন্ধ্রপ্রদেশে এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করলেন।

জলপাইগুড়ির অর্থনীতি মূলত চা কেন্দ্রিক এই দিকটি বেশি প্রচার ও প্রাধান্য পাওয়ার ফলে, জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনায় অন্যান্য শিল্প বাণিজ্য প্রসঙ্গগুলি তেমন গুরুত্ব পায়নি, বিষয়গুলি সর্বসমক্ষে আসা দরকার। বামফ্রন্টের শাসনকালে জলপাইগুড়ির বিধায়ক ও তৎকালীন মন্ত্রী নির্মল বসু লিখেছিলেন— 'ভারত সরকারের শিল্প সংজ্ঞা অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলা শিল্পবিহীন'। চা তো শিল্প বলে গণ্য ছিল না। নির্মলবাবুদের সেই সময় গড়ে তোলা শিল্পতালুকগুলির প্রায়ই অচল, কোনও সম্ভাবনাই সূচিত করতে পারে নি। বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলি শ্রমিকরা কোনও বিকল্প জীবিকার সন্ধান পান নি।

জলপাইগুড়িতে সমৃদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের অতীত ইতিহাস ছিল, সেই পথ ধরে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তেমন প্রচেষ্টা লক্ষ্যিত হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলে বণিকদের আনাগোনা হত। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসে দেখেছি, মধু সাধু খাঁ নদীপথে ঘুরছেন। চেচাখাতায় র‍্যালফফিচ ঝোলা কাঁধে নেমে পড়ছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঠানো প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যিক দলের প্রধান ছিলেন জর্জ বোগলে, তাঁর বিবরণে জানা যায় তিব্বতে নিযুক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চীনা দ্রব্য খরিদ করে বাংলা ও ভারতের নানা প্রান্তে পাঠাতেন। এই সব দ্রব্য বিক্রির জন্য তারা জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে রংপুর পর্যন্ত যেতেন। ইংরেজ বণিকরা প্রশাসনিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিনা শুল্কে জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত নিরুপদ্রবে অবাধে বাণিজ্য করত।

চা ব্যাতীত, তামাক ও পাটের ব্যবসারও প্রসিদ্ধি ছিল জলপাইগুড়ির। এক সময়ে জলপাইগুড়ির তামাক গুণমানে এত উঁচু ছিল যে, এর বেশিরভাগটাই বার্মায় চলে যেত। তৈরি হত পৃথিবী বিখ্যাত বার্মা চুরুট। স্বাধীনতার পর জলপাইগুড়ির তামাকের উড়িষ্যার কটক, ভুবনেশ্বর, উত্তর-পূর্ব ভারতের তেজপুর, জোড়হাট, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় কারখানাগুলিতে যথেষ্ট চাহিদা ছিল। উড়িষ্যার 'গুড়াখু' তৈরির কারখানাগুলিতে এখনও চাহিদা আছে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তামাক গাছের পাতা, ডাঁটার নির্যাস দিয়ে কীটনাশক ওষুধ প্রস্তুত করা হচ্ছে। তামাকের মত কৃষি বাণিজ্যিক পণ্যের আবাদ আগের তুলনায় অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যের উপর কিছু বিধিনিষেধও আরোপিত হয়েছে, তবু এইসব ক্ষেত্র ছাড়াও কীটনাশক তৈরির ক্ষেত্রে তামাকের নতুন চাহিদা তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ির এই অর্থকরী ফসল সম্পর্কেও নতুন করে ভাবা দরকার।

প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সাথে জলপাইগুড়ি জেলার বাণিজ্যিক বিনিময় হত অতীতে। ফালাকাটা, ময়নাগুড়ির অদূরে ভোটপট্টিতে, রাসমেলা, জলপেশ মেলায় আসতেন ভুটানি ব্যবসায়ীরা। উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্য প্রবেশের দ্বার ছিল জলপাইগুড়ি। ভুটান তিব্বত থেকে আসত হাতির দাঁত, মৃগনাভি, গণ্ডারের শিং, পশম ও পশমের কম্বল, মধু-মোম, টাঙন ঘোড়া, নানা প্রকার ভেষজ ঔষধী, তেজপাতা, রুদ্রাক্ষ, রিঠা পিপুল ইত্যাদি। জলপাইগুড়ি হয়ে বাংলা থেকে যেত তাঁত বস্ত্র, কাঁসা, পেতল, তাম্রপত্র, সুপুরি, চিঁড়ে, গুড়, চিনি, এলাচ, লবঙ্গ, মশলা, শুকনো মাছ, সর্ষের তেল, তামাক, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি। ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য বিশেষভাবে তিনটি বিশেষ প্রবেশ দ্বার ছিল, আমবাড়ি, ফালাকাটা ও হান্টুপাড়া। একমাত্র বক্সাদুয়ার প্রবেশদ্বার সারা বছর খোলা থাকত। এই ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। যদিও আলিপুরদুয়ার এখন আর জলপাইগুড়ির নয় স্বতন্ত্র জেলা। ভুটানের প্রবেশদ্বার সীমান্ত নগরী জয়গাঁর ফুলে ফেঁপে ওঠাতে জলপাইগুড়ির বিশেষ কোনও লাভ হয় নি। ইন্দো-ভুটান বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে, ভৌগোলিক সুবিধাটুকু থাকা সত্ত্বেও জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীর তেমন কোনও ভূমিকাই নিতে পারে নি। ভুটানের চুখা জলবিদ্যুৎ পরিষেবাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তোলা। সার্ক রাস্তার সুবিধা ও আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলা তেমন কাজে লাগাতে পারল না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার প্রাকৃতিক রূপ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জলপাইগুড়ি জেলার অঙ্গচ্ছেদের ফলে আলিপুরদুয়ার এখন স্বতন্ত্র জেলা। সুন্দরী ডুয়ার্স এখন আর শুধু জলপাইগুড়ির নয় আলিপুরদুয়ার জেলারও একটা বড় অংশ। জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান আকর্ষণ বন ও বন্য প্রাণী। পাহাড়ি নদী, ঝরনা, সবুজ অরণ্য, চা-বাগানের সবুজের সম্মোহিত দিগন্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতেই নয় বিশ্বের পর্যটন দরবারেও খ্যাত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এখনও উত্তরবঙ্গ বেড়াতে এসে দার্জিলিং, মিরিক, গ্যাংটক দেখেই চলে যান, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন বন্যপ্রাণের কথা অনেক সময়ই যথার্থ প্রচারের অভাবে আড়ালে চলে যায়। প্রচার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, থাকবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলে ডুয়ার্স হয়ে উঠতে পারে পশ্চিমবঙ্গের কেন, সারা ভারতের পর্যটন মানচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় কেন্দ্র।

জলপাইগুড়ির গরুমারা অরণ্য ব্রিটিশ শাসনকালে সাহেব-সুবোদের শিকারের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

১৯৪২ সালে এই বনকে 'গেম স্যাংচুয়ারি', ১৯৪৯ সালে 'ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, ১৯৭৬ সালে গরুমারা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি নামে এবং ১৯৯৫ সালে গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক হয়। গরুমারাকে কেন্দ্র করে ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, মালবাজার, চালসা অঞ্চলগুলির অর্থনীতিতে পর্যটন এক বড় ভূমিকা নিয়েছে। হোটেল, হোম স্টে, রিসর্ট গড়ে উঠেছে। সরকারি অতিথিশালাগুলির ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের জটিলতা ও থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে যাতে পর্যটকরা জলপাইগুড়ি অভিমুখী হন তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া ইত্যাদির সাথে ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ কম পরিচিত হওয়ায় অঞ্চগুলির কথাও পর্যটকদের সামনে আনা দরকার। ভ্রমণ-পর্যটনের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে 'ইকো টুরিজম', 'নেচার টুরিজম', ওয়াইল্ড লাইফ টুরিজম'— টুরিজমের এই নতুন নতুন উপস্থাপনার সাথেও পরিচয় আবশ্যক। পর্যটনে পেশাদারিত্ব পূর্ণ পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য, ছোট ছোট উদ্যোগী গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে সরকারি সাহায্য, সুবিধা, ঋণ বা অনুদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। পর্যটনের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার বিপুল সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে, প্রাক্তন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ড. সুব্রত গুপ্ত জলপাইগুড়ির জনমত প্রত্রিকায় (২০০৩) এ লিখেছিলেন— 'আমরা যদি জলপাইগুড়িকে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে দিতে চাই, পর্যটন ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে চাই তবে জলপাইগুড়ি জেলার মানুষকে এই কাজে উৎসাহিত করতে হবে।... চিরাচরিত অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর জোর না দিয়ে জলপাইগুড়ির অন্তর্নিহিত যে শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে তা কাজে লাগাতে পারি তবে চা এবং কাঠের উপর আমাদের নির্ভরতা কমবে। ...জলপাইগুড়িকে বাঁচাতে হলে, অরণ্যকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু যদি ভালভাবে বাঁচার পথ না চান তবে অরণ্যকে বাঁচানো যাবে না। সুতরাং অরণ্যের ভিতরে এবং অরণ্যের বাইরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।' লেখাটি প্রকাশের পর সতেরো বছর অতিবাহিত হলেও, তদানীন্তন জেলাশাসক সুব্রত গুপ্তর পর্যবেক্ষণ, জলপাইগুড়ি উন্নয়নের জন্য এই প্রস্তাবগুলি জরুরি ভিত্তিতেই অভিনিবেশ যোগ্য।

জেলাশাসক সুব্রত গুপ্ত একজন প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী, তাঁর আক্ষেপ ছিল জলপাইগুড়ি জেলার নদী ও জলসম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় নি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় তিনি তাঁর রিপোর্টে তুলে ধরেছিলেন। সংক্ষেপে সেগুলি হল— (ক) জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম বড় সমস্যা হল সেচের চরম অপ্রতুলতা, WAPCOS (Water and Power Consultancy Service)-র সমীক্ষা অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীর সংখ্যা প্রায় ১৮৮টি। মাটির ওপর এই বিপুল জলসম্পদ ছাড়াও জলপাইগুড়িতে ভূগর্ভস্থ জলের একটি বড় ভাণ্ডার রয়েছে। এই বড় সম্পদ এখনও অব্যবহৃত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলায় একমাত্র তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্ট ছাড়া অন্যান্য নদীকে সেচ ও অন্য কাজে তেমন ভাবে ব্যবহার করা হয় নি। (খ) WAPCOS সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে আকস্মিক বন্যার সংখ্যা এবং প্রকোপ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধ্বস, বন্যা এবং উচ্চহারে ভূমিক্ষয় এই অঞ্চলের বড় সমস্যা। মৃত্তিকা ক্ষয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণ পলি পাহাড় থেকে বয়ে নিয়ে আসছে। উচ্চহারে নদীগুলিতে পলি জমছে। ভুটানে ধারাবাহিক ভাবে ডলোমাইট তোলার ফলে এখানকার নদীগুলির বুকে পলি জমে ভরাট হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ ছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা, নদীর গর্ভ মানুষের দখল করে নেওয়া, পরিকল্পনাবিহীন দ্রুত নগরায়ণ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলায় নদীকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় নতুন যথার্থ কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ড. সুব্রত গুপ্তর পরামর্শ ছিল— 'জলপাইগুড়ি জেলার একটি বড় সমস্যা হল নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়া। যদি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নদীর পূর্বের গতিপথ

পরিবর্তনের পূর্ব পরিসংখ্যানের সঙ্গে বর্তমান অবস্থানের তুলনা করা যায় এবং বিভিন্ন বছরে উপগ্রহচিত্রের সাহায্যে গাণিতিক মডেল তৈরি করা যায় যার সাহায্যে এই অঞ্চলের নদীর চরিত্র বোঝা যেতে পারে এবং গতিপথ পরিবর্তন সম্পর্কে আন্দাজ করা যেতে পারে তাহলে একটি যুগান্তকারী কাজ হবে।'

দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে জলপাইগুড়ি তাল মেলাতে পারছে না উপযুক্ত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে। রেল পরিষেবার উন্নয়ন দরকার। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি যাতে থামে তার ব্যবস্থা নেওয়া, প্রতি বছরই বন্যায় বা অন্য কোনও কারণে উত্তরবঙ্গ রাজধানী কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক্সপ্রেস হাইওয়ের কাজ যেসব জায়গায় বন্ধ হয়ে আছে তা শেষ করা দরকার। জলপাইগুড়িতে তিন নম্বর রেল ঘুমটিতে উড়ালপুলের দাবী দীর্ঘকালের। অতীতে একবার উত্তরবঙ্গ বণিকসভা রাণীনগরে রেলের কোচ নির্মাণ করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনবিঘা হস্তান্তরের সময় তেঁতুলিয়া করিডরের দাবী উঠেছিল চক্ররেল। রেলের বৈদ্যুতীকরণের দাবি, বিমানবন্দরের দাবি আজও পূরণ হয় নি। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে যে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা দরকার, এ বিষয়টি জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে আজও বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। ফুলবাড়ি পোর্ট, নিউ জলপাইগুড়ি পোর্ট, জলপাইগুড়ি দূরদর্শন, উত্তরকন্যা নামে জলপাইগুড়ি জেলার হলে এই সবই গ্রেটার শিলিগুড়িরই অংশ। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সম্পর্কেও একই কথা। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ জলপাইগুড়ির সার্বিক উন্নয়নে তেমন আশা জাগাতে পারেনি। এই অঞ্চলের মানুষ স্বপ্ন দেখে, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি দুই প্রতিবেশী শহর হয়ত আগামী দিনে হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের মত যমজ শহর হবে। উন্নয়নে দুটি শহরই সমান গুরুত্ব পাবে।

রাজ্যের আশি শতাংশ শিল্প কলকাতা ও সন্নিহিত জেলায় অবস্থিত। বাকি জেলাগুলি মূলত কৃষিনির্ভর, জলপাইগুড়ি জেলাও তাই; কিন্তু কৃষি উন্নয়নে জেলাগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে মূলত সেচ ব্যবস্থার পার্থক্য থাকায়। জলপাইগুড়ি জেলায় সবজি, আলু, তরমুজ ইত্যাদির প্রচুর ফলন হচ্ছে কিন্তু হিমঘর ও পরিবহণের সুযোগ, বাজারে নিয়ে যাবার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে চাষীরা দাম পাচ্ছে না। জলপাইগুড়িতে এই সব ফসল ফলানো অলাভজনক হওয়ায় চাষীরা উৎসাহ পাচ্ছে না। কৃষিতে উন্নতি হলেও তার সুফল কৃষকেরা নিতে পারছে না। ফলে কৃষকের সংখ্যা

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় নতুন যথার্থ কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ড. সুব্রত গুপ্তর পরামর্শ ছিল— 'জলপাইগুড়ি জেলার একটি বড় সমস্যা হল নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়া। যদি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নদীর পূর্বের গতিপথ পরিবর্তনের পূর্ব পরিসংখ্যানের সঙ্গে বর্তমান অবস্থানের তুলনা করা যায় এবং বিভিন্ন বছরে উপগ্রহচিত্রের সাহায্যে গাণিতিক মডেল তৈরি করা যায় যার সাহায্যে এই অঞ্চলের নদীর চরিত্র বোঝা যেতে পারে এবং গতিপথ পরিবর্তন সম্পর্কে আন্দাজ করা যেতে পারে তাহলে একটি যুগান্তকারী কাজ হবে।'

কমছে, বাড়ছে খেত মজুরের সংখ্যা। যারা মূলত প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন কৃষক। এদের সংখ্যা জলপাইগুড়ি জেলাতে ক্রমশ বাড়ছে, গ্রামগুলিতে তীব্র বেকারি, ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল দলে দলে চলে যাচ্ছে। করোনা সঙ্কট কালে লকডাউনের সময় কাজ হারিয়ে দলে দলে এই পরিযায়ী (মাইগ্রেন্ট লেবার) শ্রমিকেরা জেলায় ফিরেছেন। মানব উন্নয়ন সূচীতে উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলি পিছিয়ে। এক দার্জিলিং জেলা বাদে। পাশাপাশি এই দুই জেলার

অবস্থান দার্জিলিং (৪), জলপাইগুড়ি (১০)। বিনিয়োগ করতে গেলে যে চাহিদা দরকার, তা জলপাইগুড়িতে না থাকার কারণে জেলার বড় অংশের মানুষের দারিদ্র, বেকারত্ব, ক্রয় ক্ষমতার অভাব।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়, মানব উন্নয়নসূচকে জলপাইগুড়ির অবস্থান স্পষ্ট হয় নিম্নোক্ত সারণীতে (সূত্র ঃ উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্ভাবনা ও ক্রয় ক্ষমতা ঃ মানস দাশগুপ্ত। ২য় উত্তরবঙ্গ শিল্প বাণিজ্য মেলা-২০০৮, স্মারক পত্রিকা। জলপাইগুড়ি) ২০২১ এসেও এই সূচকের খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।

জীবনে নানারকম অশান্তি হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার জন্ম হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা কতটা অনুন্নত বা পশ্চাদ্‌পদ সে বিষয়ে সরকারি ভাষ্য ও স্থানীয় মানুষদের অভিজ্ঞতার মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে। জলপাইগুড়ির উন্নয়নে বিভাজনের রাজনীতি কাম্য নয়।

পরিশেষে জলপাইগুড়ি উন্নয়ন প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন বারবার মনে আসছে, একটি অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়লেই কি আঞ্চলিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে জাতিগত বা গোষ্ঠীগত ভাবে? সরকার

	মানব উন্নয়ন সূচক	**স্বাস্থ্য সূচক**	**আয় সূচক**	**শিক্ষা সূচক**
পশ্চিমবঙ্গের গড়	০.৬১	০.৭০	০.৪৩	০.৬৯
দার্জিলিং	০.৬৫	০.৭৩	০.৪৯	০.৭২
জলপাইগুড়ি	০.৫৩	০.৬১	০.৬৮	০.৬০
কোচবিহার	০.৫২	০.৫০	০.৪১	০.৬৪
দিনাজপুর	০.৫১	০.৬২	০.৩৯	০.৫৩
মালদহ	০.৪৪	০.৪৯	০.৩৬	০.৪৮

সমস্যা থাকলে সমাধানের পথ খোঁজাই বিধেয়, জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিষ্ঠান বিরোধী বৈশিষ্ট্যের কথা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানো, বিধানসভা নির্বাচনে এই এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির ভিন্ন পথে ও মতে অবস্থান। বন্যা, অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণ, উন্নয়ন প্রসঙ্গে অবহেলা ইত্যাদি বিবাদে জলপাইগুড়ি উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে থাকার মিথ কতটা সত্য বা অপপ্রচার, তা অনুসন্ধান যোগ্য। জলপাইগুড়ি এখনও সুদিনের অপেক্ষায়, হৃত গৌরব ফিরে আসবে, প্রগতি ও পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে যাবে এই জেলা, এই বিশ্বাসটুকু অনেক সমস্যার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে জেলাবাসী।

আমাদের চোখের সামনে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি, শুধু নাগরিক জীবন নয় গ্রাম জীবনও। অর্থনৈতিক অগ্রসরতা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মূল্যবোধের ভাঙন রাজনৈতিক দিশাহীনতা জেলাবাসীকে অস্থির করে তুলছে। সমাজ

কেন কোনও উপজাতীয়তাবাদ জন্ম নেবার আগে যথাযথ দৃষ্টি দেবেন না সমস্যাগুলোর প্রতি। এতে এখানকার পরম্পরা, সৌহার্দ, জেলার সার্বিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হয়। দেখতে হবে সামগ্রিক ভাবে, জাতপাতের ঊর্দ্ধে উঠে, সমগ্র জলপাইগুড়ি বাসী নির্বিশেষে। পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে দেড়শ বছরের জলপাইগুড়ির প্রাপ্তির ঘরে কী কী যোগ হল, বিয়োগ হল? লক্ষ্য রাখতে হবে এই চলার ক্ষেত্রে সে কোন নতুন পথের সন্ধান পায় কি না!

সূত্র:

১। জলপাইগুড়ি জেলা শত-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদনা চারুচন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্য। জলপাইগুড়ি, ১৯৭০

২। উত্তরবঙ্গ জাতীয় বণিকসভা ও উন্নয়নের রূপরেখা ঃ একটি তথ্যায়ন

৩। উত্তরবঙ্গ শিল্প ও বাণিজ্যমেলা ২০০৮ ঃ স্মারক পত্রিকা। সম্পাদনা ড. রণজিৎ কুমার মিত্র। জলপাইগুড়ি, ২০০৮

কেন আজ আদিবাসী ‘সারনা’ পৃথক ধর্মের স্বীকৃতি চায়?

দেবপ্রসাদ রায়

গত নভেম্বর মাসে আমি আলিপুরদুয়ারে সুশীল আর পরিমলকে ডেকেছিলাম। সুশীল ওঁরাও, পরিমল ওঁরাও। আদিবাসী সারনা যুব সমিতির এই দুই নেতা তখন বারোভিসা থেকে বাগরাকোট পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। তবুও সময় করে এলো। পদযাত্রা কেন— জানতে চাইলে অনেক কথাই উঠে এল। ব্রিটিশ আমল থেকেই জনগণনায় আদিবাসী সমাজকে সুচতুরভাবে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হলেও তাদের মূল ধর্ম ‘সারনা’। তারা প্রকৃতির উপাসক। তাঁদের ‘এথনিক আইডেনটিটি’র বিলুপ্তিকরণের উদ্দেশ্যেই তাঁদের সাথে এই বঞ্চনা করা হয়েছে। আমি যেহেতু অ্যানিমিজিম ও আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে কিছুটা অবগত ছিলাম, তাই এই উদ্যোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেদিন তাঁদের খানিকটা পাশে দাঁড়াবার আশ্বাস দিয়ে আলোচনায় ইতি টানলাম। কিন্তু বিষয়টা যেন হঠাৎ করে কোনও বন্ধ দরজা খুলে যাওয়ার মত আমার সামনে একটা অনালোচিত অধ্যায় তুলে ধরল।

ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করেছিল চাতুরি ও কৌশলের জোরে। যত না লড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি এক কে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। শাসন করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে, সকলে সহজে তাঁদের আধিপত্য মানতে রাজি নয়। রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে পদে পদে বাধা এসেছে প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকে। কখনও চাকমা বিদ্রোহ, কখনও গারো বিদ্রোহ, কখনও চুয়ার বিদ্রোহ, কখনও সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আদিবাসী সমাজ থেকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন নিজ নিজ সমাজের চোখে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী— ধর্মগুরু। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুন্ডা তাঁর সমাজের কাছে বীরসা ভগবান, নাগা বিদ্রোহের নেতা যাদোনাং, রাম্পা বিদ্রোহের নেতা আলুরি সীতারামারাজু, গারো বিদ্রোহের নেতা ছপাতি গারো— সবার ক্ষেত্রেই এই বিশেষণ প্রযোজ্য, সবার আন্দোলনেই ধর্মকে হাতিয়ার করতে দেখা গেছে।

ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছিল, মূলস্রোতের মানুষের সাথে এদের মেলানো যাবে না। কারণ, ১৭৯৩-এর ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ নতুন জমিদার শ্রেণির জন্ম দিলে চুয়ার, পাইক, গারো, চাকমা, সাঁওতালরা এই মধ্যশ্রেণিকে সহজে মানতে চায় নি। তাই ১৮৭০ সালের ‘গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট’-এ গভর্নর জেনারেলকে ট্রাইবাল এরিয়া শাসন করবার প্রয়োজনে সরাসরি আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হল। সেখান থেকেই পরবর্তীকালে ট্রাইবাল এরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করে ‘এক্সক্লুডেড এরিয়া’ ও ‘পার্সিয়ালি এক্সক্লুডেড এরিয়া’-কে সংরক্ষিত শাসিত এলাকা হিসাবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত উঠে আসে। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর এই সংরক্ষণের ধারাগুলি সংবিধানের ‘পঞ্চম তপশিল’ ও ষষ্ঠ তপশিল’-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

যে কথা বলছিলাম, একদিকে আদিবাসীদের

সারনা সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁদের ধর্মীয় আচার পালন করছে

'সারনা' বা 'সারি' পৃথক ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি না পেলেও অন্তসলিলা নদীর মত প্রবাহিত হয়েছে, হারিয়ে যায় নি। আজ তাঁরা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ধর্মীয় আগ্রাসনের সামনে স্বীয় ধর্মরক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প দেখছে না।

শাসনাধীন রাখার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেলের হাতে তুলে দেওয়া হল, অন্যদিকে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মিশনারিদের পাঠিয়ে ধর্মান্তকরণের কাজ শুরু করা হল। পাশাপাশি, জনগণনায় তাঁদের হিন্দু সমাজভুক্ত করে দেওয়া হল। এই ত্রিমুখী আক্রমণের সামনে দেশের আট শতাংশ আদিবাসী তাঁর স্বীয় ধর্মের সাংবিধানিক মর্যাদা আদায় করতে পারে নি, কিন্তু এই ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে আজ তারা স্বাধীনতার ৭২ বছর পরে এত সোচ্চার কেন? 'সারনা' বা 'সারি' পৃথক ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি না পেলেও অন্তসলিলা নদীর মত প্রবাহিত হয়েছে, হারিয়ে যায় নি। আজ তাঁরা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ধর্মীয় আগ্রাসনের সামনে স্বীয় ধর্মরক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প দেখছে না। এই প্রেক্ষাপটে সপ্তম ধর্ম হিসাবে সারনা ও সারি ধর্মের দাবি ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে।

ব্রিটিশ, আট শতাংশকে ধর্মীয় পরিচয়হীন করতে পারলেও যেহেতু ৭৫ শতাংশ হিন্দু আর ২৫ শতাংশ মুসলমানকে ধর্মহীন বা ধর্মান্তরিত করা যাবে না, তাই সেক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের মানুষকে বিভাজিত করে রাখাটাই এ দেশ শাসন করবার পূর্ব শর্ত বলে ধরে নিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এ ধারনা আরও বদ্ধমূল করে দেয়। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে মুসলিম সমাজের অগ্রণী ভূমিকার জন্য তাদের অনেকদিন বৈষম্যের শিকার হয়ে মাশুল চোকাতে হয়েছে এবং এর অবসান ঘটাতে, ১৯০৬ সালে স্যর সৈয়দ আহমেদ এক প্রতিনিধিদল সহ লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করে এই বৈষম্যের দূরীকরণে তাকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানালে, লর্ড মিন্টো হাতে চাঁদ পেলেন। মরলে-মিন্টো রিফর্মসের কাজ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। তাদের সুপারিশে ১৯০৮-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' পাশ করলে এদেশে যে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গঠিত হল, তাতে মুসলিম সমাজকে সেপারেট ইলেক্টোরেট দিয়ে, হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়া হল। ঘটনাচক্রে ১৯০৬ সালেই মুসলিম লীগেরও জন্ম হল। বাবা আম্বেদকরের দাবি মেনে ১৯৩২-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ডিপ্রেসড্ পিপলস্ ফেডারেশনকে সেপারেট ইলেক্টোরেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে গান্ধীজী পুনার ইয়েরাভারা জেলে আমরণ অনশন শুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তা বাতিলও করতে হল, এবং আম্বেদকরের শর্তেই সমঝোতা হল, কিন্তু ১৯০৯-এর বিভাজনের চক্রান্ত স্থায়ীরূপ নিয়ে ১৯৩৫ পর্যন্ত টিকে থেকে দেশ ভাগ করে তার যতিচিহ্ন টানল। ১৯০৬ এ-ই যদি সেদিনের নেতৃত্ব, যাঁরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধে পথে নেমেছিলেন, শাসকের সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত অনুধাবন করতে পেরে সেপারেট ইলেক্টোরেটের বিরোধিতা

করে তাঁরা পথে নামলেও বাতিল করাতে সক্ষম হলে, হয়ত দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা মেনে নিতে হত না। বঙ্গভঙ্গ রোধে পথে নেমেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হাতিয়ার করলেন রাখিবন্ধন উৎসব। উৎসবকে আন্দোলনের হাতিয়ার করলেও তা বহুধার্মিক দেশে জাতীয় আন্দোলনের চেহারা নিতে পারল না— হিন্দু উৎসব বলে। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে ১৯৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসন রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র চর্চা নিষিদ্ধ করে দিলে রমনার মাঠে বটমূলের নীচে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব পালনের যে সূত্রপাত হয়, আজ তা জাতীয় উৎসবের আকার নিয়েছে— কারণ ধর্ম গন্ধহীন উৎসব সকলকে এক ছাতার তলায় আনতে সক্ষম হয়েছে।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলের ডাকে সাড়া দিয়ে গান্ধী যখন ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এলেন, দেড় বছর কেবল দেশটাকে চিনবার প্রয়োজনে এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ভ্রমণ করে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে বুঝতে চেয়েছেন। যে চারটি বিষয় তাঁর সামনে উঠে এসেছিল, তাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। বাকী তিনটি (অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, স্বদেশী ও স্বরাজ) নিয়ে তিনি তত বিচলিত ছিলেন না, জানতেন সময়ের সাথে সাথে সেগুলি নিজের গতিতে পূর্ণতা পাবে, কিন্তু, এই দুই সম্প্রদায়কে এক মঞ্চে না আনতে পারলে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাফল্যের ইতিহাস বিলম্বিত হবে। ১৯২০ সালে খিলাফত, ১৯২৪ সালে কোহাটের দাঙ্গার প্রতিবাদে ২১ দিনের অনশন, '৪৬-শের নোয়াখালি যাত্রা', ৪৭-এ বেলেঘাটা— গান্ধীর কোনও উদ্যোগই এই সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে পারে নি, কারণ ১৯০৬ সালে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল তা মহীরুহে পরিণত হওয়াতে গান্ধীকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে দেশ ভাগ দেখতে হয়েছে। কখনও কি আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় নি? দেশবন্ধু নিয়েছিলেন, ১৯২৩ সালে। ১৬ ডিসেম্বর তিনি যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ঘোষণা করেছিলেন, তা যদি কোকনদে অনুষ্ঠিত এআইসিসি অধিবেশনে প্রথাগত ত্রুটির অজুহাতে বাতিল না হত, তাহলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশ নায়কদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে নিয়ত বিব্রত করেছে— হয়ত তার একটা পরিসমাপ্তি ঘটত।

ভারতীয় সম্প্রীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উল্লেখ করেছিলেন, সে বৈচিত্র্য কেবল ধর্মে নয়, ভাষায়, সংস্কৃতিতে, খাদ্যাভাসে, প্রান্তে, বর্ণে, পোশাকে এমনকি পরিবেশেও। কিন্তু স্বাধীনতার লড়াইকে ধর্মীয় বিতর্ক এত বেশি প্রভাবিত করেছে যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাকেই জাতীয় ঐক্যের একমাত্র উপাদান ভেবে নিলাম, ভাষা নিরপেক্ষতা, সংস্কৃতি নিরপেক্ষতা, প্রান্তনিরপেক্ষতা—জাতীয় স্তরে কখনও প্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টি করতে পারল না। অর্থাৎ, সেকুলারিজম জাতীয় স্তরে প্লুরালিজম (বহুত্ববাদ)-এর একটি অংশ না হয়ে পরিপূরকের মর্যাদা পেয়ে গেল। অন্যভাবে বলা যায়, 'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা' কেবল ধর্মীয় বৈচিত্র্যের খাঁচায় বন্দি হয়ে রইল। কেন এই অভিশাপ থেকে কখনও মুক্তি পাওয়া গেল না, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর একটি নিবন্ধে বলেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে যখনই সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানে দুই ধর্মের নেতারা বসে আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে চেয়েছেন, কিন্তু এর প্রতিকার উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কোনও যৌথ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। উপরন্তু দুই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে আলোচনায় বসে নিজেদের জাতীয় নেতার স্তর থেকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন।

আন্দোলন যে ধর্মের বেড়া ভেঙে দেয় আজ তা আর একবার কৃষক আন্দোলন প্রমাণ করে দিল। ২০১৭-র দাঙ্গার স্মৃতি ভুলে আজ মুজাফ্ফরনগরের জাঠ ও মুসলমান কৃষক একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 'কালা কৃষি বিল' বাতিলের লড়াই লড়ছে। এই লড়াই কি কোনও বার্তা দিচ্ছে? ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসে এক সভায় 'আন্তর্জাতিক বাংলাভাষা-সংস্কৃতি সমিতি'র আবেদন বোধহয় একটা দিশা দেখাল। সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়া, ওড়িয়া-র মত বাংলাভাষাকেও ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে একটা রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে উঠুক। ভাষা তার মর্যাদা পাবে, রাজ্য পাবে সম্প্রীতি।

আমাদের ভবিষ্যৎ কি তালিবান ? নাকি 'টাইম মেশিনে'র জেলির তাল ?

নিখিলেশ রায়চৌধুরী

জীবনে একবারই বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ২০০৫ সালে। কম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামে। ফেরার সময় ব্যাঙ্কক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অনেকক্ষণ কাটাতে হয়েছিল। বিশাল কাচের জানালা দিয়ে বহু দেশের প্লেনের ওঠানামা দেখার পাশাপাশি লাউঞ্জেও বহু চরিত্র দেখেছি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন এক মওলানা। তাঁদের থেকে একটু দূরে চলছিল উত্তেজিত আলোচনা। এক পাকিস্তানি তরুণ চোস্ত ইংরেজিতে ভারতের মুণ্ডপাত করছিলেন। আর এক তরুণের সঙ্গে তাঁর তর্ক হচ্ছিল। সেই তরুণ ভারতীয়। ইংরেজিতে তিনি পাকিস্তানি তরুণের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। আর এক ইংরেজ ফ্রেঞ্চ-কাট মধ্যস্থতার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা দামী ওয়াইনের বোতল। ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টেই কোনও ওয়াইন শপ থেকে কেনা। ফ্রেঞ্চ-কাটের দাঁড়িপাল্লা অবশ্য পাক তরুণের দিকেই হেলে ছিল। কারণ, সে ইমরান খানের মত ইংরেজি বলছিল।

সেই বিতর্কের জায়গায় ভারতের শ্রোতাই ছিল বেশি। পাকিস্তানের কোনও শ্রোতাকে দেখি নি। কিন্তু কেউ সেই পাক তরুণকে ধরে ঠেঙায় নি। সেখানেই আলাপ হয়েছিল কুণালের সঙ্গে। তাঁর পদবী ভুলে

গিয়েছি। বঙ্গসন্তান। মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। পরে আর একজনের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর নাম মলয়। একসঙ্গে দিল্লি ফিরেছিলাম।

পাকিস্তানি তরুণটিকে এখনও ভুলি নি। শ্যামলা রং। পেটানো চেহারা। দেখলে মেয়েরা প্রেমে পড়ে যাবে। হাইট পাঁচ চারের মত। ভারতকে গাল পাড়ার সময় তাঁর চোখ দুটো জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, মহম্মদ আটার কোনও ভাইকে দেখছি। ভারতকে গাল পাড়ার কারণ অবশ্য অবশ্যই কাশ্মীর ইস্যু।

পাকিস্তানের জন্মই হয়েছিল ঘৃণা থেকে। সেই ঘৃণা যে ২০০৫ সালেও মেটে নি, ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে তা বুঝতে পেরেছিলাম। এত ঘৃণা কীসের? ব্যর্থতার?

ক্রিকেটে, হকিতে জিতে রাগ কিছুটা মিটতে পারে। কিন্তু পরপর যুদ্ধ বাধিয়ে হেরে যাওয়ার জ্বালা কিছুতেই মেটে না। বিশেষ করে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। দিনটা ভারতের কাছে গর্বের দিন। কিন্তু পাকিস্তান পারলে দিনটাকে ক্যালেন্ডার থেকে মুছে দেয়। 'আল্লা-আর্মি-আমেরিকা'র কৃপায় বেঁচে থাকা দুগ্ধপোষ্য পাকিস্তান এটুকু বোঝে নি, মুখ থেকে ওই তিনটে 'এ'র ফিডিং বটলটা সরে গেলে সে আর বাঁচবে না!

বিপদে আপদে পাকিস্তানকে ভারতই বাঁচিয়েছে। ডঃ মনমোহন সিংয়ের আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত পাকিস্তানে ভারত থেকে খাদ্য গিয়েছে, ওষুধ গিয়েছে, অর্থ পাঠানো হয়েছে। পরিকাঠামোগত সহায়তা ভারত থেকেই গিয়েছে। বিনিময়ে ওরা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী পাঠিয়েছে। ভারতের সেনা অফিসার-জওয়ানের মাথা কেটে নিয়ে গিয়েছে। বিপদের সময় যার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে তাকেই আঘাত করেছে।

পাকিস্তানের কাছে ভারতের কিছু চাওয়ার নেই, পাওয়ারও নেই। অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। আজ না হলেও কাল তা ভারতেরই হবে। এদিকে বিচ্ছিন্নতাকামী কাশ্মীরিদের মগজধোলাই করা হয়, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সবাই ভালো আছে। হাতে হাতে ডলার-পাউন্ড ঘুরছে। ওদিকের কাশ্মীর জানে, কারা ভালো আছে। তারা মিলিটারি বুটের তলায় আছে। তাদের কথা শোনার কেউ নেই।

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এসে পশ্চিমবঙ্গে উদভ্রান্ত-উৎকেন্দ্রিক বাঙালিদের কানে মন্তর পড়ে। এপারেও বাংলা, ওপারেও বাংলা। তোমাদের দুঃখ আমরা বুঝি। আমাদেরও একই অবস্থা। দেখবে, একদিন তোমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গোয়েজ বদলে হিন্দি করে দেবে!

বাংলায় এখন তালিবানি চাষ-আবাদও ভালো। তাদের মগজ ধোলাইয়ের চোটে অনেক বাঙালির এখন মনে হচ্ছে, বাংলায় তালিবানি শাসনের মত একটা কিছু হলে মন্দ হত না। খালি ওরা মেয়েদের খোলামেলা পোশাক নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। আর

বাংলায় এখন তালিবানি চাষ-আবাদও ভালো। তাদের মগজ ধোলাইয়ের চোটে অনেক বাঙালির এখন মনে হচ্ছে, বাংলায় তালিবানি শাসনের মত একটা কিছু হলে মন্দ হত না। খালি ওরা মেয়েদের খোলামেলা পোশাক নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। আর টিভি পছন্দ করে না। গান শুনতে দেয় না। মদ খেতে দেয় না। এগুলোর ব্যাপারে একটু শিথিলতা থাকলে ওরা খারাপ নয়।

টিভি পছন্দ করে না। গান শুনতে দেয় না। মদ খেতে দেয় না। এগুলোর ব্যাপারে একটু শিথিলতা থাকলে ওরা খারাপ নয়।

তালিবান যখন আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় মাথা তুলছে তখন সেদেশে এক অরাজক অবস্থা। কাবুলের ক্ষমতা নিয়ে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সঙ্গে আহমেদ শা মাসুদের লড়াই চলছে। গ্রামে কেউ শান্তিতে থাকতে পারছে না। তালিবান বা মাদ্রাসার ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে শান্তি ফেরানোর কাজ করছে। মধ্য এশিয়া থেকে ভায়া আফগানিস্তান পাকিস্তানের ভিতরে খনিজ তেল ও

প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপ লাইন ঢোকানোর কাজ চলছে তখন। আফগান গৃহযুদ্ধের জন্য বহুজাতিক সংস্থার সেই পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বহুজাতিক সংস্থার কর্তাদের মনে হল, তালিবানের মত শক্তিকে যদি সহায়তা দেওয়া যায়, তাহলে তাঁদের পাইপ লাইনগুলো রক্ষা পেতে পারে। তালিবান তখন সৌদি আরব সহ আরবের বিভিন্ন শেখশাহি থেকেও প্রচুর পরিমাণে পেট্রোডলার পাচ্ছে। গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র কিছু অফিসার ছাড়া আমেরিকান প্রশাসনের সবাই আহমেদ শা মাসুদের উপর তেমন ভরসা রাখতে পারছেন না। মাসুদও বুঝতে পারছেন না, আগামী দিনে আমেরিকানরা তাঁকে দেখবে কি না। পাকিস্তানের আর্মি গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে সাহায্য দিচ্ছে। নিরুপায় মাসুদ তাঁর এক সময়ের দুশমন রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। তালিবানের সঙ্গে লড়াইটা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের উপর ছেড়ে দিয়ে, নিজেকে কাবুলের উত্তরে পার্বত্য এলাকায় গুটিয়ে নিলেন। পাইপ লাইন নিয়ে দুই বহুজাতিক সংস্থার প্রতিযোগিতার জেরে তালিবান বাহিনী আফগানিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

সেই তালিবানের ভাইরাস এখন আবার আফগানিস্তানকে জ্বালাচ্ছে, কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের ভিতরে প্রতিনিয়ত সুর-অসুরের যুদ্ধ চলছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অসুরের পূজা করছে। আবার যারা সামগ্রিকতার আরাধনা করছে, তারাও অসুরের উপাসক। তারা স্বৈরাচারী লাল চীনের উদাহরণ টানে। লাল চীন কট্টরপন্থী মুসলিম শক্তি তালিবানকেই উসকানি দেয়। এভাবেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। মানুষের ভিতরকার সুরটা মরে যায়। বৈচিত্র্যের ভিতরে ঐক্যের ছবিটা ফিকে হয়ে যায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই এখন দানোর তাণ্ডব। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারাও সেই দানোর হাত থেকে নিস্তার পাবে কী করে? এখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কে কত খারাপ কথা বলতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলে। শিশুরাও খুব দ্রুত তাতে প্রভাবিত হয়। শান্তিতে নিদ্রার দিন গিয়েছে, গ্লাটনের মত আহার আর লুসিফারের মত বিকার! সেই সঙ্গে কে কত মদ খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা। কারণ, বিলেত-আমেরিকায় সবাই মদ খায়। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাদক।

পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, বিনাশের আর দেরি নেই, লন্ডনে থেকে এ কথা লিখে গিয়েছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। অনেকে তাঁর সেই লেখা পড়ে তাঁকে জেরিমিয়া বলে তখন ব্যঙ্গও করেছিলেন। কিন্তু তার মানে তো লাল চীন কিংবা তালিবানি-ইসলামিক স্টেট মার্কা সভ্যতা দারুণ কিছুর জন্ম দিচ্ছে না! তাদের সংস্কৃতি তো বিকলাঙ্গ সংস্কৃতি। পাশ্চাত্যের ভালো ভালোই আছে, তারা মন্দটা নিচ্ছে না। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভালোটা বিসর্জন দিয়ে মন্দটা নেব কেন?

মন্দ সব সময়েই তাণ্ডবের উপাসক। কোনও সুস্থ মানুষ তাণ্ডব চায় না। আবার, তাণ্ডব ভুলতে মদ-মাদকেরও আশ্রয় নেয় না। তাণ্ডব করতেও মদ-মাদক লাগে, তাণ্ডব এড়াতেও মদ-মাদক। ঘুরে ফিরে সেই এ-ক পাপচক্র।

কিন্তু পৃথিবী থেকে এখনও শুভ বোধ হারিয়ে যায় নি। বাপুজির সেই তিন বানরের গল্প এখনও অনেকেই মনে রেখেছে। খারাপ কিছু দেখব না, খারাপ কিছু শুনব না, খারাপ কিছু বলব না। মানব সভ্যতায় হিংসা ও ঘৃণা বার বার মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসার কাছে হেরে গিয়েছে। শয়তান কখনই ঈশ্বরের সঙ্গে পারে নি। আগামী দিনেও পারবে না।

অ্যাডলফ হিটলারের জার্মানিতে একটা মাদক খুব

একই টেকনিকে মগজ ধোলাই বারবার হতে দেখা গিয়েছে। এখনও হচ্ছে। শৈশব থেকেই মাথায় পুরে দেওয়া হচ্ছে ঘৃণার বিষ। শিশুদের মধ্যে ঘৃণা ঢুকিয়ে দিলে কী হয়, কিছু কাল আগে ইরাক ও সিরিয়ায় আমরা দেখেছি। হাসতে হাসতে বাচ্চা ছেলেরা বন্দিদের গুলি করে মারছে। গর্দান নিচ্ছে। তারা ভাবছে, এটা একটা খেলা।

চলত। নার্ভকে জাগিয়ে রাখার ওষুধ। সেই ওষুধ খেয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জার্মান বেকারের দল তেড়েফুঁড়ে উদয়াস্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সমরাস্ত্র বানানোর কারখানায় কাজ করত। তারা সকলেই প্রাণবন্ত, প্রাণোচ্ছ্বল। হিটলার'স ইউথের তরুণ-তরুণীরা আশপাশের দেশগুলোয় বেড়াতে যেত। হিটলারের সাঙ্গোপাঙ্গ তাদের কাছ থেকেই ওই দেশগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পেত। হিটলারের আমলে যুদ্ধাস্ত্রের কারখানায় সদ্য চাকরি-পাওয়া জার্মান বেকারের দল কিংবা হিটলার'স ইউথের তরুণ-তরুণীরা বুঝতে পারে নি, মগজ ধোলাইয়ের পাশাপাশি মাদক খাইয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধের উপকরণ হিসাবেই তাদের বলি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষে যখন বার্লিনের পতন আসন্ন জেনে রাজধানী বাঁচাতে জার্মান জেনারেলরা প্রতিরোধের ডাক দিলেন তখন দেখা গেল, কিছু বুড়ো আর কিছু কিশোর ছাড়া শহর বাঁচানোর জন্য আর কেউ বেঁচে নেই। আর্য রক্ত নিঃশেষ!

সেই একই টেকনিকে মগজ ধোলাই বারবার হতে দেখা গিয়েছে। এখনও হচ্ছে। শৈশব থেকেই মাথায় পুরে দেওয়া হচ্ছে ঘৃণার বিষ। শিশুদের মধ্যে ঘৃণা ঢুকিয়ে দিলে কী হয়, কিছু কাল আগে ইরাক ও সিরিয়ায় আমরা দেখেছি। হাসতে হাসতে বাচ্চা ছেলেরা বন্দিদের গুলি করে মারছে। গর্দান নিচ্ছে। তারা ভাবছে, এটা একটা খেলা।

একইভাবে চীনে মাওসে-তুংয়ের আমলে কমবয়সীদের দিয়েই মা-বাবা এবং তাঁদের সমবয়সীদের অপমান করানো হত। মুখে চুন-কালি লেপে রাস্তায় প্যারেড করানো হত। মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে, গলা তুড়ুং কলে ঢুকিয়ে, তাতে বিপ্লবী স্লোগান লিখে ছেলেমেয়েরাই রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত। অশ্লীল গাল পাড়তে পাড়তে। মা-বাবাদের তারা পাঠিয়ে দিত গ্রামে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। মাওসে-তুং নিজের দেশে সাত কোটির বেশি মানুষকে হত্যা করিয়েছিল।

পরে সেই ছেলেমেয়ের দল নিজেরা যখন মা-বাবা হল তখন দেখল, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আরও ভয়ংকর ভাবে তাদেরই ধ্বংস চাইছে। খুনটাকে তারা পাপ কাজ বলেই মনে করে না। এইভাবে গোটা চীনা সমাজ দেউলিয়া হয়ে গেল।

ইন্টারনেট এসেছিল বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হিসাবে। এখন তার অভিশপ্ত চেহারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমনিতেই টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটারের আলো সব সময় চোখের উপর পড়লে মস্তিষ্কে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে বাধ্য। এখন ফোনের সেটে তা আরও বেশি ক্ষতি করছে। যৌবন যেন এক মরণখেলায় মেতে উঠেছে।

কিশোর বয়সে একটা কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়েছিলাম। বাবা একটা অদ্ভুত দেখতে গাছের চারা এনেছেন। মাটিতে বসিয়ে জল দিচ্ছেন। গাছটার একটা শুঁড় আছে। ছেলে কাছ থেকে দেখতে গেল। শুঁড়টা হঠাৎ ছিটকে এসে চোখে আঘাত করল। কিশোর ছেলেটি তীব্র যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেল। হাসপাতালে যখন তার জ্ঞান ফিরল শুনল, রাতের আকাশে এক অদ্ভুত আতসবাজির খেলা চলছে। সবাই দেখছে। ছেলেটির আফশোস হল, চোখে পট্টি বাঁধা। সে দেখতে পেল না। আতসবাজির খেলা আচমকাই শেষ হয়ে গেল। যারা দেখছিল, তারা চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছে!

পৃথিবীর বুকে নেমে এল একের পর এক অচেনা মহাকাশযান। সেই মহাকাশযান থেকে নামল বড় বড় সব গাছ। শিকড়গুলো পায়ের মত হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। তাদের একটা করে শুঁড় রয়েছে। শুঁড়ের নীচের দিকে বিষের থলি। সেই শুঁড় আছড়ে পড়তে থাকল অন্ধ পৃথিবীবাসীর উপর। কিশোর ছেলেটা ভয়ে ভয়ে নিজের হাতেই চোখের পটি খুলল। সে দেখতে পাচ্ছে। সুনসান হাসপাতাল। হাসপাতালেও ভিনগ্রহের বিষাক্ত শুঁড়ওয়ালা গাছের দল ঢুকে পড়েছে। কিশোর ছেলেটা এখন কোথায় পালাবে?

নেট-অ্যাপের যুগের মহিমায় যারা উন্মত্ত সেই নেশাগ্রস্তদের ভবিষ্যৎ কি এ রকমই হতে চলেছে? তারা কি কচি বয়সেই অ্যারিস্টটল-লিওনার্দো ভিঞ্চি বনে ভেলকি দেখাবে, নাকি এইচ জি ওয়েলসের 'টাইম মেশিন' গল্পের জেলির তালের মত ড্যাবডেবে চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে মরণের দিন গুনবে?

জনসংখ্যায় ও খাদ্য উৎপাদনে এদেশে নারীরা পুরুষের সমান হলেও অর্থনৈতিক অধিকার ও মর্যাদায় পিছিয়ে

ড. সুস্মিতা মিশ্র

পশ্চিম দেশগুলিতে নারীদের ক্ষমতায়িত করা হয়েছে অনেক আগেই। এই ক্ষমতায়ন নামক বীজটি আন্তর্জাতিক স্তরে ১৮ শতকের গোড়ার দিকে বপন করা হয়েছিল। সেখান থেকে ভারতে আসে ১৯ শতকের পরে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা মানুষকে তাদের জীবনের উপরে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। আর নারীর ক্ষমতায়ন কথাটির মধ্য দিয়ে নারীদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা বোঝায়, যাতে তাদের পরিধির বাইরে গিয়ে সমাজের মূল অবস্থানে সহজে পৌঁছাতে পারে। এই জন্য বিভিন্ন নারী আন্দোলনে দুটি বিষয়ের উপরে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়— এক, নাগরিক অধিকার আর দুই, ক্ষমতায়ন।

আমাদের সংবিধানে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। অর্থাৎ লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, ভাষার বৈষম্য থাকলেও, সবাই সমান। কিন্তু নারীদের বিষয়টি সব দিক থেকে ভিন্ন। আজও ভারতে নারীরা সমাজের দুর্বল অংশ হিসাবে বিবেচিত। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজে নারীদের দেখা হয় একটি 'বস্তু' হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে নয়। তার মূল্য শুধু পুরুষ শাসিত সমাজের উত্তরাধিকারী দেওয়া এবং বাড়ির সবার দেখাশোনা করা কাজগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও, আমাদের সনাতন শাস্ত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় নারীরা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমের সমসাময়িক সভ্যতাকে ছাড়িয়ে প্রথম দিকের বৈদিক সময়কালে তুলনামূলক ভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করেছিলেন বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার মাতৃত্বের দেবী হিসাবে নারী জীবনের সমস্ত প্রতীকগুলির সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। সেই সময়, এমনকি মধ্যযুগে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজন পুরুষের তুলনায় কম থাকলেও, শাস্ত্রে কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে মহিলাদের উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছে। যদিও, ভারতে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান মধ্যযুগ থেকে অবনমন হতে শুরু করে।

তবে, গত তিন দশক বা তারও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিক্ষোভ এবং সম্মিলিতভাবে সংগঠিত নারী আন্দোলন এবং বেশ কয়েকটি সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সমাজে মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বর্তমানে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষামূলক ও অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকার এবং ন্যায় বিচারব্যবস্থা সহ অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর স্থান অর্জন করেছে। আসলে সমাজ এতদিনে উপলব্ধি করেছে যে, মানবজাতির অর্ধেক অর্থাৎ নারীকে পুরুষদের সমান অধিকার না দিলে কোনও দেশের গণতন্ত্র ধরে রাখা বা বিকাশ সম্ভবপর নয়। এত বড় মানব সম্পদকে ঠিক মত কাজে না লাগালে উন্নয়ন থমকে যাবে। বেশ কয়েকটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। তাই গবেষকরা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে লিঙ্গ সাম্যতা মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি বিষয় এবং কোনও দেশের বিকাশের সূচক এবং পূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য। কারণ, লিঙ্গ সমতা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য

উন্নয়নের ফলাফলকে উন্নত করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক বিকাশ ঘটায়। তাদের মতে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সুতরাং, এটা অনস্বীকার্য যে, নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সফল হবে যতদিন না তারা নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকার পাচ্ছে। যদিও নারীরা ভারতের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ, মোট দুই-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পাদন করে এবং উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের ৫০ শতাংশ উৎপাদন করে, কিন্তু তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পুরুষদের তুলনায় অনেক কম আয় করে, যা দেশের মোট সম্পদের ১ শতাংশ। ভারতীয় মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা বেশি থাকা সত্ত্বেও, বেশিরভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পায়। গ্রামীণ অঞ্চলে মূলত কৃষিতে এবং শহরাঞ্চলে গৃহকর্মী ও ক্ষুদ্র গৃহভিত্তিক উৎপাদনের মত স্বল্প বেতনের চাকরিতে নিযুক্ত। বিভিন্ন আধুনিক শিল্পে তাদের নিয়োগের পরিমাণ খুবই হতাশাজনক। সুযোগ পেলেও বেশিরভাগ অদক্ষ শ্রমিকের কাজ। দক্ষ শ্রমিকের কাজ পেলেও বেতন বৈষম্য চোখে পড়ার মতন। শহরেও মহিলারা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে পুরুষদের থেকে উচ্চপদে বসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ভারতে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের নিম্ন হার ইঙ্গিত দেয় যে নারীদের একটি বিশাল সংখ্যক অংশকে দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রে এখনও কাজে লাগানো হয় নি।

যদিও এর পেছনে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, পারিবারিক স্বায়ত্বশাসন। যার জেরে নারীদের এখনও বাড়ির বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, মাত্র ২৩ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন যে তাদের বাজারে যেতে বা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের দেখার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। গোয়া এবং তামিলনাড়ু (যেখানে ৫৫-৫৬ শতাংশ নারীদের স্বাধীনতা আছে) বাদে বাকি রাজ্যগুলিতে চলাফেরার স্বাধীনতার সূচকে মহিলাদের ভাগ খুবই নিরাশাজনক। এছাড়াও রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে কাজের ধারাবাহিকতা না থাকা, নিরাপত্তাহীনতা, মজুরি বৈষম্য, অস্বাস্থ্যকর কাজের সম্পর্ক, চিকিৎসা এবং দুর্ঘটনায় যত্নের

অনুপস্থিতি, গ্রামাঞ্চলে মহিলা শ্রমিকদের শোষণ ইত্যাদি। এই জন্য ভারতে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১১-১২ সালে ৩১.২ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ সালে ২৩.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

তাই বিভিন্ন গবেষকরা, এমনকি বিশ্ব ব্যাঙ্কও জানিয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মোট শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক বিকাশের জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপরে জোর দেওয়া খুবই জরুরি। একই সঙ্গে তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি এবং মহিলা কর্মীদের একটি নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যাইহোক, এককথায় বলা যায় যে, গণতন্ত্র রক্ষা এবং মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশকে নিয়ে যাবার জন্য, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অঙ্গনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার অবশ্যই সংরক্ষণ করা উচিত। নইলে দেশের উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়বে। তবে কয়েক বছর ধরে যেভাবে ভারতে সামাজিক সংস্কার এবং নারীদের শক্তিশালীকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে, একবিংশ শতাব্দীতে আমরা নারীদের এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করতেই পারি, যাতে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমমর্যাদার দাবি আদায় করে নিতে পারে।

রাজনগরের রাজনীতি। পর্ব ৭

৭৭-এ ক্ষমতায় এসেই গাঁয়েগঞ্জে সিপিএমের নৃশংসতা কোচবিহারে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সাতাত্তরে ক্ষমতায় এসে গোটা রাজ্যের সাথে সাথে এ জেলাতেও ব্যাপক ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট তাঁদের পায়ের নিচের মাটি শক্তপোক্ত করে নিল। ভাগচাষী ও বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠা পূর্ণ মাত্রা পেল। কিন্তু দ্রুত গ্রামীণ ক্ষমতা করায়ত্ব করার লক্ষ্যে কংগ্রেস সমর্থক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এমনকী সাধারণ দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের উপরও জোর জুলুম শুরু হয়ে গেল। কংগ্রেস সমর্থক তফশিলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষেরাও তাদের চোখে শ্রেণিশত্রু বনে গেলেন। মতাদর্শের নিরিখে তাদের দলে টেনে আনার পরিবর্তে গ্রামেগঞ্জে শুরু হয়ে গেল দমন পীড়ন আর খুন-খারাপির রাজনীতি। প্রথমে শুরু হলো 'অপারেশন টার্গেট'। বাম সমর্থক নয় এমন ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষেতে কাজ না থাকলেও তার বাড়িতে সাত সকালে ক্ষেত মজুর পাঠিয়ে দিয়ে দিন শেষে চাপ দিয়ে মজুরি আদায়ের প্রক্রিয়াকে বলা হতো 'টার্গেট'। পয়সা দিতে না পারলে জোর করে তার জমির ফসল কেটে নিয়ে কৃষি বিপ্লব শুরু করে দিল বাম দলগুলো। অত্যাচারে বহু মানুষ গ্রাম ছাড়া হলেন আবার অনেকে বাধ্য হয়ে বামে নাম লেখালেন। বাকিদের কপালে জুটলো চরম নির্যাতন। পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলোতে একটু একটু করে বামপন্থীদের শাসন কায়েম হয়ে গেল। ফরওয়ার্ড ব্লক আর সিপিএমের ভোট ভাগাভাগিতে যেখানে যেখানে কংগ্রেস সমর্থকরা জিতে গেলেন বেছে বেছে সেই সব এলাকায় শুরু হয়ে গেল ব্যাপক সন্ত্রাস। বামপন্থী (বিশেষ করে সিপিআইএম) দলগুলো টাঙ্গি বল্লম রামদা তীরধনুক নিয়ে মিছিলে মিছিলে গোটা জেলা সন্ত্রস্ত করে তুললো। শহরে কংগ্রেসের ছাত্রযুবদের কিছুটা প্রতিরোধ থাকায় অপারেশনের জন্য মূলত বেছে নেওয়া হল জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলকে। শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক হত্যা সন্ত্রাস। কোথাও চুরির অভিযোগে আবার কোথাও ছেলেধরা সন্দেহে পরিকল্পিত ভাবে বাম বিরোধীদের খুন, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া অথবা চোখ তুলে নেওয়ার নৃশংস কাণ্ডকারখানা শুরু হয়ে গেল গোটা জেলা জুড়ে।

১৯৭৯ সালের ৬ ডিসেম্বর ধলুয়াবাড়ির কাছে মনেয়া মিয়া নামে জনৈক কৃষি শ্রমিকের চোখ খেজুর কাঁটা দিয়ে তুলে নেওয়া হল। মনেয়ার অপরাধ সে সরকার নির্ধারিত মজুরির কমে ক্ষেতে কাজ করছিলেন। সামান্য বচসার পর ওই চরম শাস্তি। ১৯৮০ সালের ৮ জানুয়ারি রাজারহাটের কাছে মরা নদীর কুঠি গ্রামে ডাকাত সন্দেহে বীরেন দেবনাথ, শৈলেন দেবনাথ, উপেন দেবনাথ, সুকুমার দেবনাথ ও কার্তিক শীল নামে পাঁচ জনের চোখে সূচ ফুটিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হল। ১৯৮০ সালের ১৮ এপ্রিল সদর মহকুমার ছোট নলঙ্গিবাড়ী গ্রামে ডাকাতির অভিযোগে ছলি মিয়া নামে এক ব্যক্তির চোখ ব্লেড দিয়ে কেটে অন্ধ করে দেওয়া হল। এই ঘটনার ক'দিন পর জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে সন্তোষ রাণা গোষ্ঠীর নকশাল নেতা ভাস্কর নন্দী ছলি মিয়াকে

তাঁদের দলের সমর্থক বলে দাবি করেন।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আবার কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসীন হলেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা কিন্তু একটুও পরিবর্তিত হল না। বামফ্রন্টের মোকাবিলা করার পরিবর্তে এ রাজ্যের বহুধা বিভক্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে ধীরে ধীরে রাজ্যের জনমনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। কোচবিহারের অবস্থাটাও ছিল তথৈবচ। বামফ্রন্ট কংগ্রেসের এই অবস্থানের যোলো আনা ফায়দা তুলে নিয়েছিল। নির্লিপ্ত প্রতিবাদহীন বিরোধী ভূমিকায় উৎসাহিত হয়ে বামেদের অত্যাচার বেড়েই চলল।

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কোচবিহারের সাংসদ প্রসেঞ্জিৎ বর্মন রাজ্যসভায় এ জেলার অন্ধকরণের পৈশাচিক ঘটনাগুলো রাজ্যসভায় তুলে ধরেন এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মকোয়ানার কাছে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে। জেলা প্রশাসনে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপরও কিন্তু অন্ধকরণের ঘটনা বন্ধ হয় নি, বরং বেড়েই চলে।

১৯৮১ সালের ২১ জুলাই তুফানগঞ্জ মহকুমার উত্তর ফালিমারি গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সিপিএম সমর্থক একদল দুষ্কৃতকারি কংগ্রেস সমর্থক ক্ষুদ্র কৃষক চাঁদমোহন সাহাকে অন্ধ করে দিল। রোমহর্ষক ওই ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সেদিন চাঁদমোহন যখন তাঁর ক্ষেতে কাজ করছিলেন তখন প্রায় ৩০ জনের সশস্ত্র একদল সিপিএম সমর্থক তাঁর উপর চড়াও হয়। চাঁদমোহনকে একটি গাছের সাথে বেঁধে বড়শি দিয়ে তাঁর চোখ দুটো তুলে নিয়ে তাতে চুন ঢেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ২২ জুলাই চাঁদমোহনের পরিবারের পক্ষ থেকে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ হীরালাল সাহা, হরিপদ সাহা সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬ ও ৫০৬ ধারা মতে মামলা রুজু করে। এর ক'দিন পর ১৮ আগস্ট (১৯৮১) ৫ জন আসামি তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। অভিযুক্তরা সবাই সিপিএম সমর্থক। কংগ্রেস সমর্থক অন্ধ হতভাগ্য চাঁদমোহন হাটে বাজারে ভিক্ষা করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে বেড়িয়েছে।

১৯৮২ সালের ২৩ মে মাথাভাঙা মহকুমার রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাওয়াগুড়ি গ্রামে হুলুদেব দেব সিং নামে এক ব্যক্তির চোখ বেল কাঁটা দিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হয়। হুলুদেবের তরফ থেকে চামউদ্দিন মিয়া, আজিজ মিয়া ও লাল্টু প্রামানিকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হল। পুলিশ কিন্তু একজনকেও গ্রেপ্তার করে নি। কেননা তারা সবাই ছিল ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক। বরং পুলিশ উল্টো ফুলেশ্বর সিংহ নামে এক ব্যক্তিকে খুন করার অভিযোগে অন্ধ হুলুদেবকেই গ্রেপ্তার করে বসল। পুলিশি 'নিষ্ক্রিয়তা'য় (বলা ভালো 'প্রশ্রয়ে') হিংসার ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলল।

পায়ে ধরে হাজার কান্নাকাটিতেও হৃদয় গলল না বাম নেতাদের। হাটের পাশে নাপিতের দোকান থেকে নরুন এল। এর পর তিনজনকে হাত পা বেঁধে মাটিতে ফেলে নুরুনের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে তাঁদের চোখগুলো ক্ষতবিক্ষত করে তাতে চুন ঢেলে দেওয়া হল। দ্বিজেনের পা দুটোও থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। প্রচণ্ড আর্ত চিৎকারে তিন হতভাগ্যের চোখের জল আর রক্তের স্রোত একাকার হয়ে চিল্কিরহাটের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল সেদিন।

১৯৮২ সালের জুন মাস। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার জোড়াইতে ঘটে গেল এক নৃশংস গণহত্যার ঘটনা। ডাকাত বা সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে একদিনে এগারো জন মানুষকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করা হল। এদের মধ্যে কংগ্রেস সমর্থক দুই ভাই

শ্রীনাথ বর্মন আর মিনত বর্মন সকাল বেলায় বসেছিলেন মায়ের শ্রাদ্ধ বাসরে। সিপিএম সমর্থকরা তাঁদের ডেকে নিয়ে যায় সেখান থেকে। হাতে কুশের আংটি পরিহিত মুন্ডিত মস্তক দুই ভাইকে খুচিয়ে খুচিয়ে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে জয় উল্লাসে মেতে উঠেছিল সশস্ত্র লাল সন্ত্রাসীরা। এক এক করে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে একদিনে এগারোজনকে হত্যা করা হল। স্থানীয় মন্ত্রী থেকে পুলিশের আইজি পর্যন্ত সবাই নিহতদের কুখ্যাত সমাজ বিরোধী বলে আখ্যা দিলেন। শুধু তাই নয় এই ঘটনার ক'দিন পর, জেলা সিপিএম দফতরে ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছিল সেই খবর। গণহত্যাকে প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে দুর্বৃত্তদের হিংসায় প্ররোচিত করার কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল বাম আমলের শুরুতেই।

১৬ মার্চ ১৯৮৩ বুধবার কোতয়ালি থানার শিলখুড়িবসে জনৈক তসর আলির বাড়ি থেকে কয়েকটি কাপড় চুরি যায়। পরদিন সকালে সন্দেহবশে প্রথমে ওই গ্রামেরই দরিদ্র মৎসজীবি আব্দার মিয়াকে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হল চিল্কিরহাটে। কাকভোরে মোরঙ্গা বিল থেকে মাছ ধরে বিক্রিবাট্টা করে সবে বাড়ি ফিরেছে আব্দার। প্রতিবেশী মনসুর মিয়া তাকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর ডেকে আনা হল রিকশা চালক দ্বিজেন ভুঁইমালি আর কৃষি শ্রমিক পরেন্দ্র বর্মনকে। তাঁদের উপর চলল অকথ্য অত্যাচার। কিল চড় ঘুষি আর বাঁশডলা দিতে দিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরে। সেখানে দীর্ঘ বিচারের পর সাব্যস্ত হল কাপড় চুরির মাশুল হিসেবে তাঁদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। পায়ে ধরে হাজার কান্নাকাটিতেও হৃদয় গলল না বাম নেতাদের। হাটের পাশে নাপিতের দোকান থেকে নরুন এল। এর পর তিনজনকে হাত পা বেঁধে মাটিতে ফেলে নুরুনের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে তাঁদের চোখগুলো ক্ষতবিক্ষত করে তাতে চুন ঢেলে দেওয়া হল। দ্বিজেনের পা দুটোও থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। প্রচণ্ড আর্ত চিৎকারে তিন হতভাগ্যের চোখের জল আর রক্তের স্রোত একাকার হয়ে চিল্কিরহাটের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল সেদিন। আব্দার দ্বিজেন আর পরেন্দ্রর চোখের সামনে থেকে পৃথিবীর আলো চিরতরে হারিয়ে গেল। গাঁয়ের কয়েক হাজার মানুষ এই পৈশাচিক ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রইলেন।

এই নৃশংস ঘটনার খবর পেয়ে জেলা সদর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এম খানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে পুলিশকে ঘেরাও করে প্রশ্ন করা হল, "ছয় টাকা করি লিটার ত্যাল পোড়ায়া কেনে তোমরা এটে আইচ্চেন? হামরাগুলা এটে কি করির আছি?"। এরপর আসামিদের গ্রেপ্তার করা তো দূর অস্ত, পুলিশ আর কথা বাড়াতে সাহস পায় নি। গুরুতর আহত অবস্থায় হতভাগ্য তিন জনকে নিয়ে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। পরদিন সদর হাসপাতালে এই প্রতিবেদককে হতভাগ্য আব্দার আর দ্বিজেন জানিয়েছিলেন তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর্থক। বিধায়ক বিমল বসু তাঁদের নেতা। বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে কাজ করেছেন। পরেন্দ্র অবশ্য কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না। আক্রান্তদের পরিবারের পক্ষ থেকে যে দশ জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল, তাঁদের একজনকেও পুলিশ কোনওদিন ছুঁতে পারে নি! পশ্চিমবঙ্গে বাম আমল থেকেই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দলদাসে পরিণত করার কাজটি শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৯৮৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে কার্যত এ জেলাকে বিরোধী শূন্য করার কর্মসুচি হাতে নিয়েছিল বাম দলগুলো। ৮৩ তে ফরওয়ার্ড ব্লকের হাত থেকে জেলা পরিষদ ছিনিয়ে নেয় সিপিআই(এম)। এরপর থেকেই নরমেধ যজ্ঞ শুরু হয়ে যায় গোটা কোচবিহার জেলা জুড়ে। রাজনীতি চলে যায় খুনের খপ্পরে। মাস তিনেকের মধ্যে খুন হয়ে যান অন্তত দশজন মানুষ। ওই নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক আর সিপিআই(এম)-এর লড়াইতে কংগ্রেস একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে। গুণে গুণে যার মাশুল দিতে হয় নিরীহ কংগ্রেস সমর্থকদের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিনই দিনহাটার বড়নাচিনা গ্রামে কংগ্রেস সমর্থক তারকান্ত সরকারকে একদল

দুষ্কৃতকারি বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। পরদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাতালের হাট থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এ ঘটনায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা সবাই ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থক।

১৭ জুন (১৯৮৩) কোতয়ালি থানার চাঁদামারি গ্রামে ফসল কাটা নিয়ে এক সংঘর্ষে তিন জন কংগ্রেস ও একজন সিপিআই(এম) সমর্থক নিহত হন। সেবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআই(এম) এবং ফরওয়ার্ড ব্লক একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়াতে চাঁদামারি গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেসের দখলে চলে যায়। এতে বিচলিত হয়ে পড়ে বামদলগুলি। পাশাপাশি নির্বাচনী ফলাফলে কিছুটা উৎসাহিত হয়ে পড়ে কংগ্রেস। ওই ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চাঁদামারির হরচন্দ্র বর্মন ছিলেন বিষাদু রায়ের চার বিঘা জমির রেকর্ডেড বর্গাদার। বিষাদুবাবুর ছেলে পেশায় শিক্ষক ধীরেন রায় ১৬ জুন লোকজন নিয়ে হরচন্দ্রকে না জানিয়েএকতরফা ভাবে সেই জমির ফসল কেটে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে পরদিন হরচন্দ্রের সমর্থক একদল সিপিএম ক্যাডার ধীরেন মাস্টারের বাড়িতে হামলা চালায় এবং কেটে আনা সেই ফসল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ১৭ জুন একদল কংগ্রেস সমর্থক ধীরেন মাস্টারের সমর্থনে স্থানীয় এলাকায় একটি মিছিল বের করে। হরচন্দ্রের সমর্থনে পাল্টা মিছিল বের করে সিপিএম। দুটি মিছিল মুখোমুখি হতেই সশস্ত্র সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ঘটনাস্থলেই কংগ্রেস সমর্থক জীবন রায় ও রমজান মিয়া নিহত হন। কংগ্রেস সমর্থকরা প্রাণ বাঁচাতে জনৈক সুবল রায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সিপিএম সমর্থকরা ওই বাড়িটিতে আক্রমণ চালায়। শুরু হয় ভাঙচুর লুটতরাজ। বাড়ির দোতলা থেকে তখন গুলি ছোঁড়া হয়। সেই গুলিতে নিহত হন গোকুল বর্মন নামে এক সিপিএম সমর্থক। পরদিন গোসানিমারির রাস্তার ধারে পাট ক্ষেত থেকে শামসুল মিয়া নামে এক কংগ্রেস সমর্থকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ২৪ জন কংগ্রেস সমর্থক ও ৮ জন সিপিএম সমর্থককে গ্রেপ্তার করে।

রাজনৈতিক জমি দখলের লক্ষ্যে এই ধারাবাহিক সন্ত্রাস জেলার গ্রামেগঞ্জে গৃহযুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। ১৯৮৩-র ৮ জুলাই মাথাভাঙার গেণ্ডুগুড়ি গ্রামে খুন হয়ে যান সিপিমের আঞ্চলিক নেতা উকিলচন্দ্র দাস। রাতের বেলায় উকিলবাবু সবে খেতে বসেছেন। ঘরে ঢুকে পেছন থেকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছিল, আগে তিনি নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগে দু' বছর আগে তাঁকে ঐ পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় একজন কুখ্যাত ডাকাত উকিলবাবুর বাড়িতে এসেছিল। তার সঙ্গে উকিলবাবুর কথা কাটাকাটি হয়। এ ঘটনায় সেই ডাকাতের খোঁজ মেলে নি।

অপর একটি ঘটনায় ওই দিন গভীর রাতে তুফানগঞ্জ থানার ধলপলে একদল দুষ্কৃতকারি সিপিএমের স্থানীয় নেতা গৌতম দে-এর বাড়িতে চড়াও হয়। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গৌতমবাবুকে তারা খুন করে। সিপিএম অভিযোগ করে কংগ্রেস সমর্থক দুষ্কৃতকারীরা গৌতমবাবুকে হত্যা করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন সকালে ধলপল হাটের পাশে কংগ্রেস সমর্থকদের পাঁচটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গৌতম হত্যার ঘটনায় মোট ৮ জন কংগ্রেস সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আগুন লাগানোর ঘটনায় একজনও গ্রেপ্তার হয় নি। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য চণ্ডী পাল পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন, ঘটনার দিন গৌতমবাবু তুফানগঞ্জ থানার ওসি-কে টেলিফোন করে তাঁর জীবনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ওসি তার কথায় কোনও গুরুত্ব দেন নি। সময়মত ব্যবস্থা নিলে গৌতমবাবু খুন হতেন না বলে চণ্ডীবাবু অভিযোগ করেন।

এরপর আবার জোড়া খুন। মাথাভাঙা মহকুমার শীতলকুচি থানার বড় ধাপের চাত্রা গ্রামে ১৯৮৩ সালের ১৩ জুলাই সিপিএম সমর্থকরা সুরেন্দ্র বর্মন ও দ্বিজেন্দ্র বর্মন নামে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করে। সম্পর্কে এরা ছিলেন বাবা আর ছেলে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এরা নাকি ডাকাতির সাথে যুক্ত ছিল। পুলিশ জানায় এরা গ্রাম রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল। জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য সন্তোষ মুখার্জি ওই দুজনকে তাদের দলের সমর্থক বলে দাবি করেছিলেন।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। দ্বিতীয় পর্ব

গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

গত চার দশকে ধরে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কতটা বদল এনেছে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক? কতটা এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে? প্রত্যন্ত উত্তরবাংলার দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা জাগানো ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে যেটুকু বদল ঘটেছে তা একদিনে হয় নি, ব্যাংক কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় তা তিলে তিলে হয়েছে। পিছিয়ে পড়া উত্তরের বিবর্তনের পথে সেসব কথাগুলি কি কোথাও লেখা রইবে না? অবসরপ্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংক কর্মী ও এই ব্যাংকের প্রথম নিজস্ব ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রশান্ত নাথ চৌধুরী এবার থেকে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করলেন তাঁদের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের গোড়া থেকে গড়ে ওঠার গল্প। স্মৃতি হাতড়ে বের করে আনছেন নানান টুকরো টুকরো কথা ও কাহিনি।

দুই

জামালদার মেস জীবনে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার, ভালবাসার অভাব ছিল না। প্রচুর আড্ডা আর উদ্দেশ্যহীন গ্রাহক সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো— এমনটাই ছিল দিনগুলো। এর মধ্যে একদিন চেয়ারম্যান প্রদীপ দাস সাহেব জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে ব্র্যাঞ্চে এলেন, সঙ্গে এসেছিল শ্রীহরি মজুমদার। উনিও আমাদের মতই নতুন চাকরি পেয়ে বেরুবাড়িতে জয়েন করেছেন। উনি ছিলেন ফিল্ড অফিসার কাম অ্যাকাউন্টটেন্ট। সংক্ষেপে 'ফোকা'। দাস সাহেব বলেছিলেন উনি কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদ্য নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। সেই পদ ত্যাগ করে তিনি ব্যাঙ্কে জয়েন করেছেন। শ্রীহরি সরল সাধাসিধে মানুষ। ফরোয়ার্ড ব্লকের ডেডিকেটেড কর্মী। পরে বুঝেছি গরীব মানুষদের সাহায্য করতে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল সে।

তাই বলে ব্লকের সভাপতি থেকে ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসার হিসেব মেলান মুশকিল। এরপর কোচবিহারে জয়েন করলাম। ব্যাংক কর্মীদের নিজেদের জীবিকার স্বার্থে ইউনিয়ন একটা করা দরকার, আলাপ আলোচনা চলছিল। আমাদের সমসাময়িক কয়েকজন মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে উত্তরবঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ওদের গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কাজের অভিজ্ঞতা চাকরি পেতে কিছুটা সাহায্য করেছিল। তাদের মধ্যে শান্তি ঘোষাল, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, সুনীল মন্ডলের সঙ্গে বেশ সখ্যতা হয়েছিল। ওদের পরামর্শে আমরা প্রয়াত দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। তখনও দিলীপদাদের প্রতিষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোশিয়েশন' ছিল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একমাত্র সর্বভারতীয় সংগঠন। ম্যানেজার

থেকে সুইপার সব্বাই একই সংগঠনে। বড়দের দাদা ও ছোটদের নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ ছিল। 'স্যার' কালচার ছিলই না প্রায়।

যতদূর মনে আছে ১৫ই এপ্রিল ১৯৮০ বাংলা নববর্ষের দিন কোচবিহারের স্টেট ট্রান্সপোর্টের অডিটোরিয়ামে প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন জন্ম লাভ করেছিল। দিলীপদা সেদিন সকালেই ট্রেনে এসেছিলেন। সারাটা দিন সভায় থেকে বিকেলে ট্রেন ধরে ফিরে গেলেন বহরমপুর। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ম্যানেজার থেকে দিন-হাজিরার কর্মী সবাই ওই একটাই ইউনিয়নে থাকবে। মোহন রায় সভাপতি, শ্রীহরি মজুমদার সম্পাদক, সমীর সেনগুপ্ত, সাগর ব্যানার্জী, বহ্নিশিখা মজুমদার এবং আর ও কয়েকজনের সঙ্গে আমিও প্রথম কার্যকরী সমিতিতে স্থান পেয়েছিলাম। সে খুব মধুর সময় ছিল। কোনও দলাদলি নেই সবাই যেন একই পরিবারের সদস্য। পরে সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা সময়ে আন্তঃ ইউনিয়ন রেষারেষি কালের নিয়মে বেড়ে গিয়েছিল।

সে সময় মেসেঞ্জার ভাইদের দিন হাজিরা ছিল কুড়ি টাকা। অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিত দরবার করত হাজিরা বাড়ানোর জন্য। তখন নতুন নতুন শাখা খোলা হচ্ছিল। যখন তখন স্টাফদের এখান থেকে ওখানে বদলি করা হচ্ছিল। কর্মচারীদের সমস্যা বাড়ছিল। একদিন চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় সেই যথেচ্ছ ট্রান্সফার ইস্যু উঠে এল। আমরা বরুণ চন্দের অন্যায় বদলি স্থগিতের দাবি জানালাম। উনি একটু কটু মন্তব্য করে ফেলেছিলেন। আমরা বললাম "আপনি মন্তব্য তুলে নিন এবং দুঃখ প্রকাশ করুন।" এরপর ওনাকে ঘেরাও করা হল। তৎকালীন ব্যাঙ্কের একজন নন-অফিসিয়াল ডিরেক্টর রাতে এসে মিটমাট করিয়ে ছিলেন। জলপাইগুড়ির অসীম দাস সাত মাসে ছয় বার বদলি হয়েছিল।

সে সময় আমার উপর খুব চাপ। প্রতি মাসে ৬-৭টা ব্রাঞ্চ খুলতে হচ্ছে। বাড়ি ঠিক করা, ফার্নিচার, স্টেশনারির ব্যবস্থা করা চলছিল। ইতিমধ্যে আমাদের হেড অফিস পঞ্চরঙ্গী মোড়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাশেই অবিনাশ সূত্রধরের কাঠের ফার্নিচারের দোকান। এমনও হয়েছে স্টিল ফার্নিচার সেল্‌ফ, সাইনবোর্ড, স্টেশনারি লোড হয়ে ট্রাক অবিনাশবাবুর দোকানের সামনে দাঁড়ানো, ফার্নিচার রেডি করতে আরও দু'ঘণ্টা লাগবে। ডেলিভারি পয়েন্টে হয়ত ম্যানেজারবাবু অপেক্ষারত। ট্রাক রওনা না হলে আমার মত দু-এক জনের নিস্তার নেই।

১৯৮০ সনের কয়েকটা ঘটনা আমি অনেকবার বিভিন্ন পরিসরে বলেছি। বহুবার বলেছি। প্রথম যেদিন ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা এক কোটি টাকা স্পর্শ করল সেদিন আমরা হেড অফিসে উদযাপন করেছিলাম রসগোল্লা সহযোগে। আজ সেই ব্যাঙ্কের ব্যবসা ছয় হাজার কোটিতে পৌঁছাতে চলেছে। সেদিনের দশ টাকায় কেনা রসগোল্লার কোনও তুলনা হয় কি?

১৯৮০ সনের ২রা অক্টোবর আমরা সাংগঠনিক ভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে ইন্দিরাজী আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমাদের সভাপতি আশীষ সেন এম.পি. এবং সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনায় ছিলেন। দু-একজন আমলা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মগন ভাই বারোট। আমরা আলোচনা স্থল থেকে অনেক দূরে রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছি। ফিরে এসে আশীষদা বলেছিলেন, ইন্দিরাজীর সাদর আপ্যায়ন মনে রাখার মত।

নেতাদের কথা শুনে ইন্দিরাজী মগনভায়ের অভিমত জানতে চাইলেন। মগন ভাই বারোট বলেছিলেন "গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলো গাঁয়ের মুদি দোকানের মত।" আশীষদার ধমক খেয়ে বারোট বললেন "ওটা গ্রামের পোস্ট অফিসের মত"। আশীষদা পিএম কে বলেছিলেন "ম্যাডাম আপনি একটা পোস্ট অফিস দেখান যারা গ্রামের গরীব মানুষদের লোন দেয়"। ইন্দিরাজী উপায় না দেখে বারোটকে চুপ করে বসতে বললেন। উনি বলেছিলেন "আমি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করব। পরে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন"।

রিজার্ভেশনে ছাড়া জেনারেল কামরায় অর্ধসেদ্ধ হয়ে দিল্লী পৌছে বিড়লাদের ধর্মশালায় পৌঁছেছিলাম।

ওখানেই নিরামিষ ভোজন। দিলীপদা তক্তপোশে আর আমি ও রামদা মেঝেতে। সেই জেনারেল ডাব্বা, আরো ভীড়। ভাগ্যিস অসমের বন্ধুরা পাশেই ছিল। সে সময়ে আমরা একটানা তিনদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিতে পারতাম। আমার সেবার দিল্লী সফরে রবিবার সহ পাঁচ দিন লেগেছিল। অর্জিত ছুটি খাতায় জমা থাকা সত্ত্বেও ছুটি মিলল না, চার দিনের বেতন কাটা গেল। পরবর্তিতে সেই বেতনের টাকা ফেরত পাওয়া যায় নি। অবসরের পর সাংগঠনিক কাজে যখনই বিমানে সফর করেছি, মনে পড়েছে ১৯৮০-র ভ্রমণের কথা।

দিল্লী আসার সময় সহকর্মী বন্ধু সুনীল মিত্র ৫০ টাকা ও সংগঠন থেকে ৪০ টাকা দিয়েছিল। শেষের দিন টিকিট কাটার পর আমার কাছে ১০ টাকাও ছিল না। সেই সুনীলদের বাড়ি ছিল তুফানগঞ্জের রাস্তায়, গ্রামে। বাড়ি ঘিরে ছিল চাষের জমি। সুনীলকে দেখেছি খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে জমিতে কোদাল চালাতে। তুফানগঞ্জের রাস্তায় গেলে ফেরার পথে অবশ্যই সুনীলদের বাড়ি যেতাম। বাটি ভরা গরম পায়েস, মুড়ি সহযোগে অনেকবার খেয়েছি, তাছাড়া ওদের খামারে উৎপন্ন নানা তরিতরকারি এনেছি। ওর মনটা ছিল বিশাল। নিজের জীবনযাত্রা ছিল একেবারে সাদামাটা। যে কেউ বিপদে পড়লে ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। ওর অসুস্থতার খবর পেয়ে কোচবিহারে গেলাম। ও লড়াই করে হেরে গিয়েছিল। সুনীল বন্ধুদের মনে চিরটাকাল ভাস্বর থাকবে।

দ্বিতীয় ব্যাচের ম্যানেজার জয়ন্ত রায়ের কথাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ওর জীবনে শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজে সিরিয়াস। সুদর্শন চেহারা, সুন্দর ব্যবহার। আলিপুরদুয়ার শাখায় ম্যানেজার ছিল। ব্যাঙ্কের সঙ্গেই একটা চালু চায়ের দোকান, সেই দোকানের মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি সিঙ্গারার স্বাদ একেবারে ভুবনমোহিনী। জয়ন্ত ঘুমাতে যেত রাত দুটোয়, সকালে উঠত নয়টার পরে। ভাড়াবাড়িতে থাকত। ফ্রেশ হয়েই অফিসে চলে আসত, কিছু না খেয়েই। অফিসে এসেই দু-তিনটে সিঙ্গারা সহযোগে চা খেয়ে কাজে লেগে পড়ত। দুপুরে খাওয়ার ঠিক ঠিকানা ছিল না। এ ভাবেই একদিন গুরুতর অসুখে অকালে ঝরে গিয়েছিল। ওর মৃতদেহের দিকে দেখে আমার একবারও মনে হয় নি ও আর কোনওদিন কথা বলবে না।

আর একটি মেয়ের স্মৃতি চল্লিশ বছর পরেও অমলিন। নাম তার হতে পারে বন্যা। হালকা স্বরে কথা বলত। কাজে ছিল খুব তৎপর। মেয়েটি বিবাহিতা ছিল। কখনও ওকে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতে দেখি নি। হাসিখুশি কিন্তু কথা খুব কম বলত। অফিসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সখ্যতা যথেষ্টই ছিল। মনে আছে একদিন তোর্ষা ব্রিজে জ্যাম ছিল আমি জলপাইগুড়ি থেকে বাসে ফিরছিলাম। অফিসে আসতে দেরি হয়েছিল। সেদিন জরুরি একটা রিফাইনান্স স্টেটমেন্ট চেয়ারম্যান সাহেব কলকাতায় নিয়ে যাবেন। ফলে চাপ ছিল কাজের। সে সময় শ্রী প্রদীপ দাস মহাশয় ওয়ার্কিং শীটও দেখতে চাইতেন। কাজেই জল মেশানোর কোনও সুযোগ ছিল না। প্রচুর খেটে বেলা তিনটেয় কাগজপত্র চেয়ারম্যান সাহেবের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। সব সেরে নিজের চেয়ারে এসে বসতেই বুঝলাম, খিদেয় পেট জ্বলছে। বন্যা সবটাই নজরে রেখেছিল। একটা প্লেটে টোস্ট, ওমলেট ও মিষ্টি এগিয়ে দিয়েছিল। আমি তাকাতেই স্নেহভরা কণ্ঠে বলেছিল "খেয়ে নিন"। এত স্নেহময়ী মেয়েটি যে নিজের মনের ভেতর যে কত ব্যথা বয়ে বেড়াত সেটা টের পেয়েছিলাম ওর আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনায়। এখনও অবসরে ভাবি বন্যা যে কেন অসময়ে সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে চিরবিদায় নিয়েছিল?

বিয়োগ ব্যথা সরিয়ে রাখি আপাতত। হেড অফিস থেকে একদিন প্রতিটি শাখায় সার্কুলার যাচ্ছিল। আমাদের ইউনিয়ন থেকেও সব সদস্যদের একটা চিঠি পাঠানো দরকার ছিল। অফিসের খামেই ইউনিয়নের চিঠি পুরে দেয়া হয়েছিল। প্রতিমা দত্ত ডেসপ্যাচে কাজ করছিল। হঠাৎ চেয়ারম্যান এসে ডেসপ্যাচ থেকে কয়েকটা খাম তুলে নিয়ে প্রতিমাকে তার চেম্বারে ডাকলেন। উনি বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, "কে তোমাকে অফিসের খামে ইউনিয়নের চিঠি পাঠাতে বলেছে, তার নাম বল"। ধমক দিচ্ছিলেন বেশ কড়া ভাষায়। বুঝলাম দিন কয়েক আগেই যে ওনাকে

ঘেরাও করা হয়েছিল তারই ঝাল ঝাড়ছেন। প্রভাস দাস ভেতরে গিয়ে বলেছিল "আমি প্রতিমাকে বলেছিলাম"। সঙ্গে সঙ্গেই আমিও চেয়ারম্যান সাহেবের চেম্বারে ঢুকে বলেছিলাম, "প্রতিমার দোষ নেই আমি ওকে ওইভাবে ইউনিয়নের চিঠি পাঠাতে বলেছিলাম"। প্রতিমা বিপুল চাপ সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল। একটু সুস্থ হলে ওকে বাড়ি পাঠালাম। স্যারও নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। বুঝলাম ঝড় আসতে চলেছে।

সন্ধ্যায় প্রতিমার বাড়ি গেলাম সমীরকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতিমা দরজা খুলে বলেছিল "মা কিন্তু কিছু জানে না"। মাসিমা কাছে আসতেই বলেছিলাম "আজ মুড়িমাখা খাব না। লুচি বেগুন ভাজা হোক"। তখন সম্পর্কটা এমনই ছিল। এটুকু বুঝেছিলাম প্রতিমা ব্যাপারটা পুরোপুরি সামলে নিয়েছে। আড্ডা মেরে বেশ রাত করে বাসায় ফিরেছিলাম। প্রতিমা আমার শুধু বোন নয় অবশ্যই অভিভাবকও ছিল। কিন্তু দাস সাহেবের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। ইউনিয়ন থেকে তখন নানা দাবি নিয়ে বেশ কড়া চিঠি পত্র পাঠান হচ্ছিল। দুর্যোগের ঘনঘটার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

দার্জিলিং জেলার পোখরিয়াবঙে শাখা উদ্বোধন করতে হবে। বাড়ি ঠিক করতে গিয়েছিলাম। বাড়ি মাত্র দু-চারটে। এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের বাড়ি পছন্দ হয়েছিল। বেলা চারটের সময় সুখিয়াপোখরি হয়ে দার্জিলেঙের শেষ গাড়ি ছেড়ে গেল। একটা চায়ের দোকানে ঠান্ডা নিমকি ও বিশাল সাইজের খুড়মা খেয়ে লাঞ্চ সেরেছিলাম। ইতিমধ্যে সেই মাস্টারমশাই এলেন, তার বাড়ি দেখলাম। কথাবার্তা হল। কথা শেষ করেই বাইরে এলাম। পাঁচটায় নাকি একটা দুধের গাড়ি দার্জিলিং যায়। আবার সেই চায়ের দোকানে ছ'টা বাজল, গাড়ি পেলাম না। দোকানে আমার বয়সি দুই তরুণ বাঙালি চা পান করছিল। ওরা বলেছিল "গাড়ির আশা ছাড়ুন। আমরা এসএসবি তে কাজ করি, আমাদের মেসে রাতটা থেকে যান"। অচেনা মানুষকে এমন বিপদে ওরা নিজেদের মনে করে সাহায্য করেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ব্রীজ (তাস) খেলেছিলাম। পরে আর কোনওদিন ওদের সঙ্গে দেখা হয় নি।

ফিরে আসার পরদিন সকালে অফিসে এসেই বদলির অর্ডার। দিনহাটার কাছে নিগমনগর শাখায়। আমাকে কিছু না বলেই সেই বদলির অর্ডারটা কেন জানি না বেশ মর্যাদায় লেগেছিল। যিনি চার্জ নিলেন তিনিও আমার বন্ধু লোক, কিন্তু আমাকে কিছু জানায় নি। আমি সেদিন প্রায় জোর করে রিলিজ নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গেলাম। তখন নিগমনগরে তাপস দেব ক্লার্ক আর রতন সাহা সাব স্টাফ। কয়েকদিন কোচবিহার থেকে যাতায়াত করছিলাম। বিয়ের কথা ডিসেম্বরে। দিলীপদাকে চিঠি লিখেছিলাম "পরিবেশ বেশ জটিল, এমন অবস্থায় বিয়ে করা কি উচিত হবে"? উনি সোজা বললেন "তুমি তোমার জায়গায় ঠিক থাকো, কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না"। একবছর পর সাধারণ সভায় এসে আমার বাড়িতে দুপুরে খেয়েছিলেন, অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন।

একবার নিতাই প্রসাদ গাঙ্গুলি, প্রভাস দাস ও আমি নিজেদের কিছু সমস্যা নিয়ে দিলীপদার গোরাবাজারের বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। নানা পরামর্শ দিলেন, একটা ডেপুটেশন ড্রাফট করে দিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়া দিলীপদার বাড়িতেই। এমন অত্যাচার বৌদিকে প্রায়ই সহ্য করতে হত। দিলীপদার পুত্র কোকো তখন খুব ছোট। পরে অনেকবার যেতে হয়েছে। প্রথমবারের স্মৃতি ভাস্বর হয়ে আছে এক টিটিই সাহেবের দৌলতে। ট্রেনে ফেরার সময় খাগড়াঘাট স্টেশনে আমরা ভিড় দেখে রিজার্ভেশন কামরায় উঠে পড়েছিলাম। এক টিটিই সাহেব প্রায় ঘাড় ধরে পরের স্টেশনে নামিয়ে দিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার এক স্টেশন। দৌড়ে গিয়ে জেনারেল ডাব্বায় কোনওমতে উঠেছিলাম। বাথরুমের সামনে কাগজ পেতে প্রভাস ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত ওকে ডিঙ্গিয়ে যাত্রীরা টয়লেটে যাচ্ছিল আর গাল দিচ্ছিল। আমি মালদাতে বসার জায়গা পেলাম আর নিতাইবাবু বগির মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কয়েকদিন পর আবার বহরমপুর এসেছিলাম ওদের কনফারেন্সে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

বাংলা ভাষার বীর ভূমি এপারের গ্রাম বাবলা

জাহির রায়হান

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলতে পারি?' কোনও আত্মসচেতন বাঙালিই বোধহয় এই দিনটিকে ভুলতে পারে না। কেননা এই ভাষাই হল তার পরিচয়, এই ভাষাতেই প্রথম মা ডাকা, এই ভাষাতেই অ আ ক খ, এ যে তার গর্বের ভাষা। ফেব্রুয়ারি সেই মাতৃভাষার মাস, ফেব্রুয়ারির একুশ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'।

যে কয়জন সাহসী বাঙালির আত্মবলিদানে আজকের এই স্বীকৃতি, তাদের অন্যতম আবুল বরকত এই বাংলারই সন্তান। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলাস্থিত সালার থানার বাবলা গ্রাম তাঁর বসতবাটি। মানব জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থে, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও খাদ্য সংগ্রহের বাস্তবতায়, নানান যৌক্তিক অযৌক্তিক প্রবৃত্তির তাড়নায়, জমি সম্পত্তি, টাকাকড়ি করায়ত্ত করার উদগ্র উগ্রতায় দুনিয়ায় হয়েছে বহু যুদ্ধ, বহু রক্তাক্ষয়ী সংগ্রাম, ভবিষ্যতেও হবে অথবা বর্তমানেও হয়ে চলেছে বিরামহীন। কিন্তু নিজ মাতৃভাষাকে ভিন্ন ভাষার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে, আবুল বরকতসহ অদম্য বহু বাঙালির যে স্বতস্ফূর্ত গণ আন্দোলন তা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। এ এমন এক আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মগরিমার লড়াই যা সমর্থন না করে থাকা যায় না।

সালার থানার অন্তর্গত বাবলা গ্রামকে 'বরকত নগর' বলে উল্লেখ করে 'আবুল বরকত স্মৃতি উদযাপন কমিটি'। গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষ আবুল বরকতকে চেনে 'আবাই' নামে। দলিল লেখক মরহুম সামসুজ্জোহা ও হাসিনা বেগমের সন্তান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পড়ুয়া। ওপার বাংলার শহর ঢাকা তখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্থান সরকার সিদ্ধান্ত নিল উর্দুই হবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন সর্বস্তরের অসংখ্য বাংলা ভাষী মানুষ, যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। জানুয়ারি মাসের ঢাকা সফরে এসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নিজামুদ্দিন, মহম্মদ আলি জিন্না'র বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলেন উর্দুই হোক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ইতিপূর্বে ভাষা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবে তাঁরা বাংলাকে আরবি অক্ষরের মাধ্যমে লেখার সুপারিশ করেছিলেন। এহেন অনায্য প্রস্তাব ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতায় গঠিত হয় ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ। গৃহীত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা। কিন্তু সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঐদিন থেকেই ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে জারি করে ১৪৪ ধারা। সমবেত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে আইনসভার দিকে অগ্রসরের চেষ্টা করলে বেলা ৩টা নাগাদ পুলিশ ছাত্রাবাসে শুরু করে

গুলিবর্ষণ। রাষ্ট্রের নির্বিচার নির্দয় গুলিবর্ষণে আব্দুল জব্বার এবং রফিকউদ্দিন আহমেদ ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন। এছাড়া শাসকের ঐ পাশবিক আক্রমণে আব্দুস সালাম, আবুল বরকত ও শফিউরের প্রাণহানি ঘটে। ঐদিন অহিউল্লাহ নামের একজন ৮-৯ বছরের কিশোরও নিহত হয়।

আবুল বরকতের জন্মস্থান বাবলা গ্রাম প্রতি বছরই স্মরণ করে তাদের শহীদ সন্তানকে। বড় মঞ্চ করে বহু মানুষের সমাগমে উদযাপিত হয় সেখানে মাতৃভাষা দিবস পরম মমতায়। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করেন তাদের 'আবাই'-এর কারণেই পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত গ্রাম বাবলা আজ স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিক আগ্রহের মানচিত্রে। তাই নিষ্ঠাভরে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা স্মরণ করে ভাষা শহীদদের। শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি সংঘের সম্পাদক সৈয়দ সিয়াদত আলির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৯৪ সাল থেকে তাঁরা দিনটিকে স্মরণ করে আসছেন, পালন করেন আবুল বরকতের জন্মদিনও ১৬ই জুন সম্বৎসর, যদিও ইউনেস্কোর স্বীকৃতি মেলে ১৯৯৯ সালে। তিনি স্মৃতিচারণ করে জানান, বরকতের মা হাসিনা বেগমকে তিনি দেখেছেন, ছোটবেলায় 'নানি' ডাকতেন তাঁকে, দেখতেন প্রায়দিনই তিনি একটি চিঠি পড়তেন আর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন চোখের জল। পরবর্তীকালে আলিসাহেব জানতে পারেন ঢাকার ছাত্রাবাসে থাকাকালীন চিঠিটি বরকত লিখেছিল তার আব্বুকে, তক্তপোষ কেনার টাকা চেয়ে। মা হাসিনা নিজেও দিনটিকে স্মরণ করতেন মিলাদ ও কোরাণ পাঠের মাধ্যমে, উপস্থিত কচিকাঁচাদের মধ্যে বিলোতেন জল ও বাতাসা।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ভাষা শহীদের মা হাসিনা বেগমকে দিয়েছিলেন তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা। শোনা যায় এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় যাতায়াতের পথে সীমান্তে মা হাসিনার ব্যাগপত্র তল্লাশি করা বারণ ছিল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, এমনকি লাগত না তাঁর ভিসাও। কোনও এক অধিবেশনে বাংলাদেশ সংসদ ভবনে বয়ঃজ্যেষ্ঠা মা হাসিনা চেয়ারে বসতে সক্ষম না হয়ে মেঝের কার্পেটে বসে পড়েন, তাঁর সম্মানে উপস্থিত সমস্ত সাংসদেরা সেদিন একইভাবে

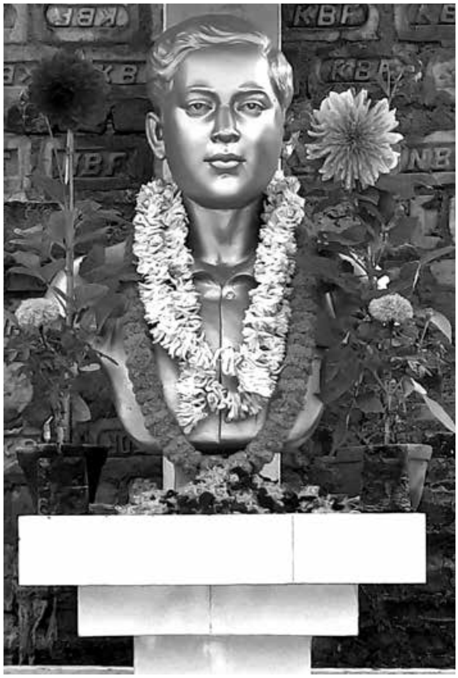

আবুল বরকত 'আবাই'

মেঝেতে বসেই শেষ করেছিলেন সেদিনের নির্ধারিত অধিবেশন। বাংলাদেশের যে গ্রামে গিয়ে মা হাসিনা আশ্রয় নিতেন বরাবর, তার নাম ছিল চন্দনা, বাংলাদেশ সরকার সে গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখে বাবলাবীথি, বাবলা নামের সাথে সাযুজ্য রেখে। তবে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে শহীদবেদীতে। বর্তমান শহীদ বেদীর মাঝের স্তম্ভটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং মাথাটি সামনের দিকে নত হয়ে আছে দেখা যায়। আসলে ওটি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হাসিনা বেগম তাঁর বীর সন্তানদের সাথে রয়েছেন দাঁড়ায়ে। পুনর্নির্মিত শহীদবেদীটি ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ বরকতের জন্মদাত্রী হাসিনা বেগম স্বয়ং।

বরকত মঞ্চের পাশেই ছিলেন বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া থেকে আগত এবিএম সৈয়দ গোলাম মহসিন খান সাহেবের সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি জানালেন 'আমার আব্বা আমাদের পাঁচ ভাইয়ের নামকরণ করেছেন 'এবিএম' দিয়ে, কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি

বাকি অংশ ৪৬ পাতায়

এই ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?

ইতিহাসের হাত ধরে গ্ল্যামারাস মালবাজার

শৌভিক রায়

মার্সিডিজ বেঞ্জ দুটি দেখে প্রথমটায় চমকে গেছিলাম। একটির রেজিস্ট্রেশন ১৯৬৬ সালের, আর একটির ১৯৬৭ সালের। অর্ধশতক পার করে ফেলা গাড়ি দুটি, আরও কিছু অন্য গাড়ির সঙ্গে, শোভা পাচ্ছে মালবাজারের এই পেট্রল পাম্পে। চালসা থেকে মালবাজারের দিকে আসতে মাল নদী পার করে সামান্য এগোলেই রায় অ্যান্ড কাজিনসের এই পাম্পটি। পাম্প লাগোয়া ছোট্ট টি বুটিক, তাতে পাওয়া যায় রায় পরিবারের মালিকানাধীন মিশন হিলস চা-বাগানের লোভনীয় দার্জিলিং চা। এখানে একটা তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের টি-বোর্ড মোট ৮৭টি চা-বাগানকে দার্জিলিং চায়ের লোগো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। মিশন হিলস সেই বাগানগুলির একটি। ভাবতে ভাল লাগে, বাঙালির সামগ্রিক অবক্ষয়ের এই মুহূর্তে যে দুই চারটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা এখনও গর্ব বোধ করি, তার মধ্যে মালবাজারের এই রায় পরিবার অন্যতম। কপর্দক শূন্য অবস্থায় উদ্বাস্তু হয়ে, ১৯৪৫ সালে দেশভাগের আগে এপারে চলে আসা এই পরিবারের প্রধান, সদ্য প্রয়াত নীলমনি রায়, নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, বটলিং প্লান্ট, পেট্রল পাম্প, মিশন হিলস টি এস্টেট-এর সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। পেট্রল পাম্প লাগোয়া টি মোমেন্টসে বসে মিশন হিলসের দার্জিলিং চায়ের স্বাদ নিতে নিতে বিশ্বাস করা যায় না যে, এই মানুষটি একটা সময় তিনি নিজে, পেট্রল পাম্পে তেল নিতে আসা গাড়িতে, তেল ভরে দিতেন।

আসলে মালবাজার জনপদটিই বোধহয় এরকম, যার পরতে পরতে বিস্ময়। আদ্যন্ত চা-শহর মালবাজারের নৈসর্গিক দৃশ্য এতটাই সুন্দর যে বছরের যে কোনও সময় মুগ্ধ হতে হয়। একের পর এক তরঙ্গায়িত চা-বাগান, অদূরের নীল পাহাড়, নানা জাতি-উপজাতির মানুষ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস মালবাজারকে ডুয়ার্সের অন্য জনপদগুলি থেকে আলাদা করেছে। একটি নদী জনপদটিকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে বলে সম্ভবত জনপদটির নাম হয়েছে মাল। সংস্কৃত 'মাল' শব্দটি মালা বা মাল্য বোঝায়। গরুবাথান অঞ্চলে ভুটান পাহাড়ে সৃষ্ট মাল নদী এই জনপদটিকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন যে এই স্থানটির নাম হয়েছে মাল। আবার মালপাহাড়ি নামের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল বলে মাল নামটির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। দ্রাবিড় ভাষায় 'মাল' শব্দটির অর্থ উঁচু জমি। মাল নামটির পেছনে ডুয়ার্সে দ্রাবিড়দের আগমন ও বসবাসের ইতিহাসটিকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জনশ্রুতি, এই স্থানটি আশেপাশের অঞ্চল থেকে উঁচু বলে বন্যার হাত থেকে রেহাই পেতে একসময় ভুটানিরা এখানে মাল রাখত। মালবাজার নামকরণের পেছনে সেই সম্ভাবনাও খারিজ করে দেওয়া যায় না। আবার একসময় জলপাইগুড়ি জেলায় মালজোত, মিয়াদি জোত ও পোড়ো জমির জোত দেখা যেত (১৮৬৬

মারিয়ামের সমাধি

সালে জলপাইগুড়ির প্রথম কমিশনার টুইডির তথ্য অনুযায়ী), মালবাজারের নাম সেই মালজোত থেকে এসে থাকতে পারে বলে অনেকের অনুমান। অধ্যাপক স্বপন কুমার ভৌমিকের 'ইতিকথায় পশ্চিম ডুয়ার্স ও মালবাজার' বইটিতে মালবাজারের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হরেন্দ্রনাথ ঘোষের উল্লেখ আছে, যাঁর মতে ১৮৮৯-৯৫ সালে জমি জরিপের কাজে আসা ব্রিটিশ সার্ভেয়ার ম্যালকম সাহেবের সংক্ষিপ্ত নাম মাল সাহেব থেকে মালবাজারের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু নাম আর কী এসে যায়! সময়ের বিবর্তনে ছবির মত সুন্দর মালবাজার তার পিকচার পোস্টকার্ড সৌন্দর্য খানিকটা হারালেও আজও পশ্চিম ডুয়ার্সের রানি ও অঘোষিত রাজধানী।

একটা সময় মালবাজার বলতেই বুঝতাম প্রয়াত মন্ত্রী পরিমল মিত্রকে। আধুনিক মালবাজারের রূপকার হিসেবে যদি তাঁকে চিহ্নিত করা হয়, তবে বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট প্রথমবার মন্ত্রিসভা গঠন করলে পরিমল মিত্র বন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৮৫ সালে মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর সময়েই তৈরি হয় মাল

একের পর এক তরঙ্গায়িত চা-বাগান, অদূরের নীল পাহাড়, নানা জাতি-উপজাতির মানুষ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস মালবাজারকে ডুয়ার্সের অন্য জনপদগুলি থেকে আলাদা করেছে। একটি নদী জনপদটিকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে বলে সম্ভবত জনপদটির নাম হয়েছে মাল। সংস্কৃত 'মাল' শব্দটি মালা বা মাল্য বোঝায়।

উদ্যান, মাল টুরিস্ট লজ-সহ বেশ কিছু সরকারি দপ্তর এবং কলেজ। অবশ্য কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তবে কলেজ স্থাপনের তাঁর কৃতিত্ব তাতে একটুও কমে নি। বরং তাঁর অবদানকে মাথায় রেখে ১৯৮৫ সালে কলেজ শুরু হলে, কলেজের নাম তাঁর নামেই রাখা হয়। চালসা থেকে মালবাজারে ঢুকতে মাল নদীর পাশে পরিমল মিত্র

স্মৃতি মহাবিদ্যালয় এভাবেই মনে করায় মালবাজারের অন্যতম রূপকারকে। ভোলা যায় না ডঃ নারায়ণ ব্যানার্জি, বিমল দাসগুপ্ত প্রমুখের অবদান। আবার বয়েজ টাউন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জন রবার্ট থ্যাটসের কথা যদি স্মরণ না করি, তবে অন্যায় হবে। ১৯৭৩ সালে এই অনাথ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু মালবাজার নয়, উত্তরের বিভিন্ন জায়গা থেকেই এখানে অনাথ শিশুরা আশ্রয় পেত। এই শিশুদের পড়াশোনার জন্য ওই একই বছরে প্রতিষ্ঠা হয় সিজার স্কুলের। ভাবতে বিস্মিত হতে হয় যে, ইংল্যান্ডে জন্ম নিয়েও ফাদার জন রবার্ট থ্যাটস মালবাজার তথা ডুয়ার্সকে নিজের করে নিয়েছিলেন। মা ভেরোনিকার, যাঁর ডাক নাম ছিল সিজার, স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্য ফাদার জনের সিজার স্কুল ও বয়েজ টাউন মালবাজারের অন্যতম গর্ব। কিছুদিন সিজার স্কুলে চাকরির সুবাদে ফাদারকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। কুকুরপ্রেমী মানুষটিকে দেখে কখনই মনে হয় নি যে, তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন হুগলির মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ এবং তিনি নিজে স্বয়ং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের এমএ এবং আমেরিকার ডেট্রয়েটটের খ্রিস্টান মিশনারি ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁকে ঘিরে বিতর্ক চললেও আমৃত্যু তিনি মালবাজারেই ছিলেন।

ইংরেজদের প্রসঙ্গ ওঠায় মালবাজারের নিকটবর্তী রাঙামাটি চা-বাগানের চাইবাসা ডিভিশনের সমাধিস্থলের কথা উল্লেখ করতেই হয়। পশ্চিম ডুয়ার্স তো বটেই, সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চলে এত প্রাচীন সমাধিস্থল আর আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, অযত্নে অবহেলায় আজ সেই ঐতিহাসিক সমাধিস্থলটি নষ্ট হতে বসেছে। অথচ সেদিন যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের এখানে শায়িত করেছিলেন, তাঁরা কোনওদিন ভাবেন নি যে, এই সমাধিস্থলের এরকম অবস্থা হতে পারে। যেমন ধরা যাক, রাঙামাটি চা-বাগানের তদানীন্তন ম্যানেজার ডব্লিউ ডি কাউলের কথা। ১৯১৯ সালে তিনি তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী পত্নী মরিয়াম ইডাকে এখানে সমাধিস্থ করেন। সমাধির ওপরে তৈরি করেন শ্বেত পাথরের অনিন্দ্যসুন্দর এক পরী, যার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত বিষাদ। বর্তমানে সেই পরীর ডানা দুটি অক্ষত থাকলেও, হাত দুটি ভেঙে গেছে। ফলকে উৎকীর্ণ লেখাটিও কষ্ট করে পড়তে হয়। আবার, ১৮৫৪ সালে স্কটল্যান্ডে জন্ম নেওয়া জন উইলিয়াম থমসন, চা-বাগানের সূত্রেই, ডামডিমে আসেন। কিন্তু ডুয়ার্সের পরিবেশ তাঁর সহ্য হয় নি। ১৮৮৯ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে এখানে সমাধিস্থ করা হয় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। একইরকমভাবে, ১৯২৩ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে সমাধিস্থ হন ফ্রেডেরিক চার্লস জর্ডান। তাঁর কর্মস্থল ছিল সাতখাইয়া চা-বাগান। জানা যাচ্ছে যে, বাগরাকোট চা-বাগানের উইলিয়াম ভ্যালেন্টাইন শিয়ারার ছিলেন টি-প্লান্টার। ১৯১৮ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুতে তাঁর ভাই ও বোন, পিটার কালটার ও আবার্ডিন, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এখানেই রয়েছে ১৮৮০ সালে মৃত রোডেরিক ম্যাকলিডের সমাধিটিও। প্রাচীনত্বের দিক থেকে, এই সমাধিটির গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে, লিস রিভার চা-বাগানের জন অ্যান্ডার্সন পার্থ দম্পতি ১৯৩৪ সালে তাঁদের ২৭ বছর বয়স্ক সন্তান জেমসের জন্য যখন সমাধিটি তৈরি করেন, তখন তাঁদের মানসিক অবস্থাটিও সহজে বোঝা যায়। হয়ত একইরকম মানসিক অবস্থা নিয়ে, মিনগ্লাস চা-বাগানের মালিক জন রাইট তাঁর সন্তান জর্জকে সমাধিস্থ করেন। মৃত্যুর সময় জর্জের বয়স ছিল মাত্র আটাশ বছর। ১৯০৫ সালে নির্মিত তাঁর সমাধিতে উৎকীর্ণ রয়েছে চোখে জল এনে দেওয়া কবিতা। রাঙামাটি চা-বাগানেই কর্মরত অবস্থায় জন জেমস লিথাল লোগান ৫১ বছর বয়সে মারা যান। ১৯৪৭ সালে তিনি সমাধিস্থ হন। অন্যদিকে, বড়দিঘি চা-বাগানের সুইনটন থমাসের মৃত্যু ১৯৬৮ সালে এবং সম্ভবত তিনিই হলেন সমাধিস্থ হওয়া শেষ ব্যক্তি। এঁরা সকলেই শুয়ে রয়েছেন চা-বাগানের সবুজ বিস্তারের মাঝে এই বিরাট সমাধিস্থলে। রয়েছেন আরও অনেকে। কিন্তু সবার সমাধির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় না, কেন না সময়ের থাবা শ্বেতমর্মরে লেখা লিপিকে মুছে দিয়েছে। এখন জানতে ইচ্ছে হতে পারে যে, ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে এত সংখ্যক ইংরেজ এসেছিলেন? কারণ ছিল ১৮৭৪ সালে হুতান

রায় অ্যান্ড কাজিনের মার্সিডিজ বেঞ্জ

চাইবাসা সমাধিস্থল

সাহেবের চা-বাগান প্রতিষ্ঠা ডুয়ার্সে চা-শিল্পের সম্ভাবনাকে খুলে দিয়েছিল। এর ফলে দলে দলে ইংরেজ ভিড় জমিয়েছিলেন অরণ্য ও হিংস্র বনচারীর ডুয়ার্সে। অবশ্য সে এক অন্য গল্প। শুধু উল্লেখ্য যে, হাউটন সাহেবের সেই চা-বাগান ছিল মালবাজারের খুব কাছেই, আজকের গজলডোবায়।

ডুয়ার্সে চা-চাষের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েই চা-শিল্পের যে বিকাশ শুরু হয়েছিল, তাতেই বোধহয় লেখা ছিল মালবাজারের ভবিষ্যৎ। কেননা গজলডোবায় রিচার্ড হাউটনের প্রথম চা-বাগান প্রতিষ্ঠার পর মালবাজারকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একের পর এক চা-বাগান। আর সেই সব চা-বাগানে কাজে যোগ দিতে ইংরেজ থেকে শুরু করে বাঙালি, নেপালি, পাঞ্জাবি, আদিবাসী, এমন কি চিনা সম্প্রদায়ের

মিশন হিলস চা-বাগনের ফ্যাক্টরি

মানুষেরও আগমন হয়। ১৮৯৩ সালে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের অধীনে মালবাজারে গড়ে ওঠে বড় জংশন স্টেশন। আজ কালের নিয়মে সেই জংশন স্টেশনের গুরুত্ব হ্রাস পেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এই রেল স্টেশনের হাত ধরেই ডুয়ার্সের ইতিহাস বদলাতে শুরু করেছিল। আর এই রেলস্টেশনের জন্যই রুজিরুটির টানে ভারতের অন্য প্রদেশ থেকেও মানুষজন এসে মালবাজারকে কসমোপলিটান চেহারা দিতে শুরু করেছিল। অবশ্য এই চেহারা বদল শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৮৭৫ সাল থেকেই, কেননা মোটামুটি সেই সময় থেকেই চা-বাগানগুলির প্রতিষ্ঠা শুরু

এখানে প্রতি সন্ধ্যায় জমে উঠত ইউরোপিয়ান টি প্লান্টার-সহ চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গদের আড্ডা। ভারতীয়দের প্রবেশ এখানে ছিল না। ক্লাবের সামনে বিরাট মাঠে গল্ফ ও পোলো খেলা হত। ১৯৬১ সালে ক্লাবটিকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সামনের মাঠে সরকারি আবাসন গড়ে ওঠে।

হয়েছিল। আজ এই রেলপথ শুধু অতীত স্মৃতিই বহন করছে। কেননা ১৯৪৯-৫০ সালে আসাম লিংক প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নিউ মাল স্টেশন আজ মালবাজারের সঙ্গে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংযোগ রক্ষাকারী স্টেশন হিসেবে কাজ করে চলেছে। শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউ মাল হয়ে আলিপুদুয়ার জংশন পর্যন্ত ১৮০ কিমির রেলপথ দেশের অন্যতম সুন্দর রেলপথ বলে পরিচিত, যদিও বন্যপ্রাণী রেলপথে চলে আসায় অনেকসময় তাদের মৃত্যু হয় বলে এই রেলপথ কুখ্যাতিও কুড়িয়েছে।

মালবাজারের ক্যালটেক্স মোড় অতীতের মত আজও গুরুত্বপূর্ণ। বয়সের দিক থেকে পশ্চিম ডুয়ার্সের দ্বিতীয় প্রাচীন এই পেট্রল পাম্পটি সম্ভবত ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করে ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস অয়েল কোম্পানি আর তার থেকেই এই এলাকার নাম হয়ে গেছে ক্যালটেক্স মোড়। এই এলাকার কাছেই পানোয়ার বস্তি। শোনা যায় যে, 'পানছুকরি' নামে এক মহিলার নাম থেকে এই বস্তির নাম। মালবাজারের বয়স্ক মানুষেরা আজও বিশ্বাস করেন যে, সেই মহিলা ছিলেন অধুনালুপ্ত হায় হায় পাথার চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজারের রক্ষিতা। ক্যালটেক্স মোড়ের কাছেই আর এক বস্তি হল গুরজং। স্টেশন রোড এবং এই এলাকাগুলো ছাড়া সেভাবে মালবাজারে সেভাবে জনবসতি ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে দেশভাগ হলে, ডুয়ার্সের অন্য জনপদগুলির মতই মালবাজারেও শরণার্থীর ঢল নামে। ধীরে ধীরে তৈরি হয় আরও কিছু কলোনি। এই সময়েই মালবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় মাল আদর্শ বিদ্যাভবন। অতীতে ব্রিটিশদের সার্জন কুঠি এখানেই ছিল। তবে এই বাড়িটির মালিকানা ছিল জলপাইগুড়ির নবাবদের। সেই সময় ডঃ নারায়ণ ব্যানার্জি-সহ মালবাজারের বিশিষ্ট মানুষেরা জলপাইগুড়িতে দরবার করলে এই বাড়ি ও জমি দান করা হয়। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন নবাব পরিবারের প্রতিনিধি কিবরিয়া সাহেব। ১৯৫৫ সালে শিল্পোদ্যোগী বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ তাঁর রূপালী চা-বাগানের একটি অংশ দান করেন এবং রেলওয়ে ঠিকাদার ভবানী ব্যানার্জি বহু টাকা অনুদান দেন বিদ্যালয় ভবন তৈরির জন্য। তাঁর মায়ের নামেই তৈরি হয় সুভাষিণী বালিকা বিদ্যালয়টি। সিজার স্কুলের পাশাপাশি এই দুটি বিদ্যালয় দীর্ঘদিন একটি বিরাট অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার মূল কান্ডারি ছিল। কালের নিয়মে আরও কিছু বিদ্যালয় মালবাজারের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আধুনিক মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় থেকে শিলিগুড়ি অভিমুখে রেলব্রিজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পথের পাশেই মাল উদ্যান নিঃসন্দেহে মালবাজারের অন্যতম আকর্ষণ। উদ্যানের মাঝে বয়ে চলা শঙ্খিনী ঝোরা, নানা ধরনের ফুল, এক্যুইরিয়াম, পাম গাছের সারি, প্যাগোডা ইত্যাদি সব মিলে অনুপম সৌন্দর্যের এই উদ্যানে বহু বাংলা ছবির শুটিং হয়েছে। অবশ্য মালবাজার ও সংলগ্ন এলাকা এতটাই সুন্দর যে এখানে মাঝে মাঝেই ছবি করবার

জন্য এসেছেন চলচ্চিত্র জগতের বহু মানুষ। মালবাজারের কাছেই লুকসান বাজারে 'হাটবাজারে' ছবির জন্য এসেছিলেন অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা। 'কাঁচ কাটা হীরে' ছবির জন্য সৌমিত্র চ্যাটার্জি, লিলি চক্রবর্তী প্রমুখেরা মালবাজারে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ভানু বন্দোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী শুভেন্দু চ্যাটার্জি-সহ ছায়াছবির আরও বহু বিখ্যাত মানুষ মালবাজারে পদার্পণ করেন। তবে মালবাজারের মানুষেরা কোনওদিনই ভুলতে পারেন না দলাই লামার মালবাজারে ঘণ্টা তিনেক অবস্থানকে। একইভাবে তাঁরা মনে রেখেছেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের ক্ষণিক অবস্থানকে। এখনও প্রবীণ মানুষদের চোখে ভাসে ১৯৬১ সালের সেই সন্ধ্যার কথা যেদিন পণ্ডিত রবিশঙ্কর মালবাজারে সেতার বাজিয়েছিলেন। কে ভুলবে ১৯৬৪ সালের সেই সোনামাখা দিনগুলিকে যখন বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায় এখানে তাঁর ছবির শুটিং করছেন! আজকের মালবাজারে ক্রমাগত গাড়িঘোড়ার চলাচল, ব্যস্ততা দেখে বোঝা দায় যে, ছোট্ট এই জনপদ কত বিখ্যাত মানুষদের স্পর্শে ধন্য!

আজকের মালবাজারে বড়দীঘি অঞ্চলে উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সংঘ আশ্রম শিবোহম বালাজি মন্দির, নানুবাবুর পুকুর অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এছাড়া মালবাজারের কাছেপিঠে ছড়িয়ে রয়েছে এত কিছু যে একবারে সেসব বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আসলে এই শহরের প্রায় সর্বত্রই রয়েছে ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসে লেগে রয়েছে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আজকের দিনটি কথাও। সেইসব কথার আকার ও আয়তন এতটাই বড় যে, স্বল্প পরিসরে তার বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। যেমন, রানিচেরা চা-বাগানে ছিল নদীর তীরে যে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাবটি দেখা যায়, সেটি আসলে ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত মালবাজার ইউরোপিয়ান ক্লাব। আজকের পুষ্পিকা বিদ্যালয়ের স্থানে ছিল এই ক্লাবটি আর এখানে প্রতি সন্ধ্যায় জমে উঠত ইউরোপিয়ান টি প্লান্টার-সহ চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গদের আড্ডা। ভারতীয়দের প্রবেশ এখানে ছিল না। ক্লাবের সামনে বিরাট মাঠে গল্ফ ও পোলো খেলা হত। ১৯৬১ সালে ক্লাবটিকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সামনের মাঠে সরকারি আবাসন গড়ে ওঠে। আজও নদীর পাশে রানীচেরা চা-বাগানে এই ক্লাবের ভেতর দেখা যায় ১০০ বছরের পুরনো বিলিয়ার্ড বোর্ড ও পিয়ানো। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় গল্ফ প্রতিযোগিতার আয়োজনও হয় নদীর গা ঘেঁষা ১৮টি গল্ফ হোল সমৃদ্ধ বিরাট মাঠটিতে।

অতীত এখানে এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে, ১৯৪৮ সালে মালবাজারে ডুয়ার্স ইউনিয়ন ব্যাংক যাত্রা শুরু করেছিল। যদিও সে ব্যাংকের অস্তিত্ব বেশিদিন ছিল না, কিন্তু ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হওয়া সেই ব্যাংক প্রথম ব্যাংকের মর্যাদা বহন করে। আবার মালবাজারের নানুবাবু (সুশীল কুমার দাস) ডুয়ার্সে প্রথম সংকর প্রজাতির মাছ চাষ জোড়েন বলে প্রচলিত। তাঁর তৈরি গোবর প্লান্ট, নার্সারি ইত্যাদিও একসময় ছিল দেখবার মত। সাহিত্য সংস্কৃতি জগতেও একসময় মালবাজার বেশ পরিচিত ছিল, তবে মালবাজারের অন্য অনেক কিছুর তুলনায় তা যেন একটু ফিকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মালবাজারকে কেন্দ্র করেই চালসা, ওদলাবাড়ি, লাটাগুড়ি, ডামডিম ইত্যাদি মালবাজারের সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে সংস্কৃতির স্পর্শ লাগে। একসময় নাটক, যাত্রা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কমবেশি লেগেই থাকত আর সবচেয়ে ভাল লাগত যেটা তা হল যে, সেইসব অনুষ্ঠানে উঠে আসত ডুয়ার্সের মিশ্র সংস্কৃতি। আজ অন্তর্জাল ও সমাজ মাধ্যম এইসব কর্মকাণ্ডে খানিকটা ব্যাঘাত ঘটালেও অতীতকে ভিত করেই ইমারত তৈরির প্রচেষ্টা যেন চলছে!

প্রকৃতি ও মানব-ইতিহাসের তালমিলে মালবাজারের মত এত সুন্দর জায়গা বোধহয় ডুয়ার্সে আর দ্বিতীয়টি নেই। অদূরে হিমালয়ের সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণি, একদিকে ভুটান পাহাড়ের হাতছানি, একের পর এক চা-বাগানের সবুজ বিস্তার, তরঙ্গায়িত ভূমি আর বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ নিয়ে মালবাজার অনন্য। এখানে ইতিহাস কথা বলে, কান পাতলেই শোনা যায় সেই ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসকেই সঙ্গী করে চিনে নিতে হয় ডুয়ার্সের এই রূপসীকে।

(ঋণ স্বীকার: ইতিকথায় পশ্চিম ডুয়ার্স ও মালবাজার— স্বপন কুমার ভৌমিক, প্রয়াত প্রিয়তোষ পণ্ডিত, প্রিন্সিপাল, সিজার স্কুল, পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত জ্ঞানবাবু)

মঙ্গরজঙ্গের দিনরাত্রি

নীলাঞ্জন দাস

তিস্তাবাজার থেকে সিকিমের প্রবেশপথ রংপো ঢোকবার একটু আগেই ডানদিক দিয়ে যে রাস্তাটা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে, সেই রাস্তা ধরে কয়েক পাক উঠে সবে মেঘের ছোঁয়া পেয়েছি.... বসন্তজীর ফোন। সবাইকে বাইকগুলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড় করাতে বলে, ফোনটা ধরলাম। 'হাঁ বসন্তজী বোলিয়ে, হামলোগ আপকে বাতায়ে হুয়ে রস্তে সে করীব তিন কিলোমিটার চলে আয়ে হ্যায়। অব?' বসন্তজী যেটা বললেন, সেটা বন্ধুদের বললাম। আরও প্রায় দশ কিলোমিটার যেতে হবে। বৃহত্তর মুনসঙে, মাংচু ফরেস্টের গা ঘেঁষে একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম মঙ্গরজঙ্গে আমাদের আজকের আস্তানা 'তিস্তা রিভার ভিউ হোম স্টে'। এক বন্ধু বলে উঠল, শুধুমাত্র হোম স্টে-র নামটা ছাড়া বাকি সব তো নামেই ম ম করছে রে। কোনওদিন এ নাম শুনি নি।

তারপর, আরও আধঘণ্টা পরে পাহাড়ি রাস্তায়

মেঘ লেপ্টে, স্থানীয় মানুষজনের কাছে দিকনির্দেশ নিয়ে আমরা যখন গন্তব্যে পৌঁছালাম তখন বিকেল তিনটে। বসন্তজী বাইকের আওয়াজ শুনে হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন। আমাদের পাঁচজনের জন্য একটা বড় ঘর বরাদ্দ। কটেজের বারান্দায় উঠতে গিয়েই উল্টোদিকে একটা দৃশ্য দেখে মন ভরে গেল। বিকেলের সোনালি আলোয় নীচে দেখা যাচ্ছে পান্নাসবুজ ফিতের মত বয়ে চলেছে তিস্তা সুন্দরী। কে যেন বলল, আজ পূর্ণিমা রাতে এই বারান্দায় একদম জমে যাবে। কিন্তু তখন কে জানত, পূর্ণিমা রাতের আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে।

ঘুরতে গিয়ে যে কোনও জায়গায় গিয়ে পৌঁছবার পর আমাদের প্রথম কাজ হল, যেখানে থাকছি তার আশপাশটা একটু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া। এবারও রুমে ব্যাকপ্যাকগুলো পিঠ থেকে নামিয়ে রেখে একটু বের হচ্ছি, এমন সময় বসন্তজী এসে জানাল, আমাদের লাঞ্চ রেডি। বললাম, তার আগে একটু চা হবে নাকি? বসন্তজী সানন্দে সম্মতি জানাল। আর কটেজের পশ্চিমে কসমস ফুলে ছাওয়া জঙ্গলের মাঝে একটা শুড়িঁপথ দেখিয়ে বলল, আপলোগ ইস রাস্তে সে পাঁচ মিনিট চলে যাইয়ে, এক ভিউ পয়েন্ট মিল যায়েগা। ম্যায় ওহি চায়ে ভেজ দেতা হু।

দু'মিনিট হাঁটার পর বড় গাছগুলো শেষ হতেই সামনে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম যেন আমরা। চারপাশে শুধু হলদে-কমলা সালফিউরাস কসমসের মেলা, আর তার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছাউনিবিহীন, রেলিং ঘেরা একটা একাকী ওয়াচ টাওয়ার। আর নিচে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে তিস্তা। এক মানুষ উঁচু কসমস ফুলের বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আমরা যখন ভিউ পয়েন্টে গিয়ে উঠলাম মনে হল, যেন শূন্যে ভেসে রয়েছি। নীচে তিস্তা আর আই লেভেলে নানা নাম না জানা পাহাড় চূড়া। বললাম, আজ পূর্ণিমা রাতের আসর বারান্দায় নয়, এখানে বসবে।

হোম স্টে-র খাবার জায়গাটা অসাধারণ। কমলালেবু বাগানের মাঝে বাঁশের তৈরি আর খড়ের ছাউনি। চারপাশে ঝোলানো নানা রকমের অর্কিড ও ক্যাকটাস। লাঞ্চের মেনু গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, কটেজেরই কিচেন গার্ডেনের রাই শাক, একটা মিক্সড ডাল, আলু ভাজা, ডাবল ডিমের গ্রেভি আর স্যালাড। সেই সকালে জলপাইগুড়ি থেকে বেরোনো। মাঝে রাস্তায় গজলডোবায় চা, মংপং-এর মোমো আর তিস্তা বাজারের শসা এতক্ষণ সবার শরীরে কোনওরকমে এ.টি.পি. সাপ্লাই করেছে, তাই সবাই হামলে পড়ল। সবথেকে ভালো লাগল রাই শাক আর বেশি করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটা দিয়ে ডিমের গ্রেভিটা। খেতে খেতে বসন্তজীকে আমাদের সন্ধের ইচ্ছের কথা জানালাম। আমরাই চেয়ার-টেবিল সব নিয়ে যাব ভিউ পয়েন্টে, শুধু একটা লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে। বসন্তজী জঙ্গলের লেপার্ড, ভালুক আর বুনো শুয়োরের বিপদের কথা বললেন বটে, কিন্তু আমাদের আবদারের কাছে সেটা ধোপে টিকল না। আরও জানলাম, মঙ্গরজঙ্গে তিস্তার সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা গতিপথ দর্শন ছাড়াও বিখ্যাত হরেক রকম প্রজাপতি ও পাখির জন্য। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে উত্তর-পশ্চিমে ঝকঝকে 'স্লিপিং বুদ্ধা', কাঞ্চনজঙ্ঘা। হোম স্টে থেকে কিছুটা দূরে আছে এক প্রাচীন গাছ। গ্রামের মানুষজনের কাছে পরম পূজ্য, পবিত্র। ইংরেজদের হাত দিয়ে কালিম্পং -এর এই ছোট্ট জায়গা, মুনসঙে একসময় শুরু হয়েছিল সেসময়ের ত্রাস, ম্যালেরিয়ার যম কুইনাইনের উৎস সিঙ্কোনা গাছের চাষ। এই মুনসঙকে ঘিরে মঙ্গরজঙ্গের মত আরও কয়েকটা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল এই কর্মকাণ্ড ও সাথে বসতিও। যদিও আজ এই শিল্পের অবস্থা একদমই ভাল বলা যাবে না। এখন দেখা যাক, এই

কোভিড পরিস্থিতিতে যখন হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন সারা পৃথিবীর কাছে মহার্ঘ্য হয়ে উঠছে, সেই চাহিদার হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা এই প্রাচীন পাহাড়ি শিল্প।

প্রসঙ্গত বসন্তজীও এই সিঙ্কোনা প্লান্টেশনের একজন কর্মী। তবে চাকুরীজীবী, হোম স্টে-র মালিক এসব পরিচয় ছাড়াও বসন্তজীর আর একটা পরিচয় আছে। সেটা হল উনি একজন সুগায়ক এবং এই পরিচয়টাই ওনার সবচেয়ে প্রিয়। সেটা বুঝতে পারলাম যখন ওনাকে ভিউ পয়েন্টের সন্ধ্যা-রাতের আড্ডায় একটু গান গাইতে অনুরোধ করলাম, তখন তার সলজ্জ হাসি দেখে। আরও শুনলাম, দিওয়ালিতে স্থানীয় অনুষ্ঠান আছে, তাই এখানকার সব সঙ্গীতপ্রিয় মানুষজন সন্ধ্যা হলেই এখন পুরোদমে প্র্যাকটিস করছে।

তারপর সন্ধ্যা নেমে এল মঙ্গরজঙ্গের আকাশে। মাংচু ফরেস্টের পিছন দিয়ে ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হয়ে যেই প্রথম আলোয় আলোকিত হল কালিম্পং সিকিম পাহাড় এবং মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলা তিস্তা... সমস্ত ব্যাপারটা যেন শুটিংয়ের লাইট, সাউন্ড, অ্যাকশনের মত ম্যাজিকাল হয়ে গেল। ডানদিকের পাহাড়ি জঙ্গলটা থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ডেকে উঠল একটা সম্বর হরিণ। এদিকে আমরাও ভিউ পয়েন্টে চেয়ার টেবিল গুছিয়ে তৈরি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক হাতে চায়ের ট্রে ও আরেক হাতে পকোড়া আর বগলে তার গিটার নিয়ে হাজির বসন্তজী। প্রথমেই আমাদের অনুরোধে স্থানীয় অনুষ্ঠানে যে গান গাইবেন, সেই নেপালি গানটা গাইলেন, অসাধারণ। তারপর একে একে কিশোরকুমার, অরিজিৎ সিং হয়ে আরেকটা নেপালি গান গেয়ে আমাদের পূর্ণিমা রাতের প্রোগ্রাম জমিয়ে বসন্তজী যখন স্থানীয় ক্লাবে প্র্যাকটিসে যাবার জন্য বিদায় নিলেন, তখন রাত আট'টা। জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যাচ্ছে পাহাড়, চরাচর। এই ৩৫০০ ফুট ওপর থেকে তিস্তার আওয়াজ শোনা যায় না। চাঁদের আলোয় শুধু দেখা যায় মাত্র। আর দেখা যায় রংপো, তিস্তা বাজারের জনবসতির মিটিমিটি আলো ও তিস্তার পাশ দিয়ে সমান্তরালে এঁকে বেঁকে যাওয়া সিকিম রোডে গাড়ির ব্যাকলাইটের লাল বিলীয়মান আলোর বিন্দুগুলো। "এইইইই, এত কথা না বলে ব্লুটুথ স্পিকারে একটা হাল্কা গান চালিয়ে এই পূর্ণিমা রাতে তিস্তার ক্যাট ওয়াক দেখতে হলে চুপ করে বস তো"।

পরদিন সকাল আটটা। রাত্রে সবারই ঘুমটা ভালই হয়েছে। সেই ভিউ পয়েন্ট থেকে রাত দশটায় কটেজে ফিরে রুটি মাংসের ডিনারটাও জমেছিল বেশ। তারপর বারান্দায় রাতের তিস্তাকে আরেকটু দেখতে দেখতে আড্ডা দিয়ে ঘুম। কটেজের সামনেই এক চিলতে ফুলেল লনে কয়েকটা ফিক্সড কাঠের বেঞ্চ আছে। সকালের চা-টা ওখানে বসেই খাওয়া হল। গতকাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, তিস্তার ওপরটা ধোঁয়া ধোঁয়া, আকাশেও একটা গুমোট ভাব। পায়ে পায়ে ঘুরে এলাম এখানকার ছোট্ট মোনাস্ট্রিতে। সব জায়গায় একটা শান্তি, স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। ফিরে এসে লুচি, আলুর দম দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে, ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে চটপট তৈরি হয়ে নিলাম আমরা। আজ প্রথম গন্তব্য কাছেই, মুনসঙের জলসা ভিউ পয়েন্ট ও সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের বাংলো। যার নামকরণ স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন। তারপর একে একে রামধুরা কালিম্পং হয়ে বাড়ি ফেরত। তিস্তা রিভার ভিউ হোম স্টে ছেড়ে যাবার আগে বন্ধুরা সবাই মিলে একটা গ্রুপ ছবি তুলে দেবার জন্য বসন্তজীকে ডাকলাম। তারপর বসন্তজীর সাথে সবাই মিলে একটা সেলফি। ছবি তুলে উনি জানতে চাইলেন, এখানে কোনও সমস্যা হয় নি তো আমাদের? সমস্যা! বললাম, গতকাল রাতে আমরা বন্ধুরা আলোচনা করেছি, যদি এরপর কোনওদিন আমাদের খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি না করে কয়েকদিন শুধু চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হয় তাহলে আপনার কটেজের এই বারান্দাটা হবে আমাদের আড্ডার জায়গা বা সেই ফুলে ঢাকা অসাধারণ ওয়াচ টাওয়ারটা। বসন্তজী শুধু 'জরুর' বলে মৃদু হেসে নমস্কার জানাল।

পথনির্দেশ:

সিভক করোনেশন ব্রিজ থেকে মঙ্গরজঙ্গের 'তিস্তা রিভার ভিউ হোম স্টে'-র দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। দুইভাবে যাওয়া যাবে। প্রথমত রংপো থেকে একটু আগে ডানদিকে ভালু রোড ধরে অথবা কালিম্পং হয়ে আলগারা, পেডং রোড ধরে।

তিস্তা রিভার ভিউ হোম স্টে-র বসন্তজীর ফোন নাম্বার ৭০২৯১৮০৪৮৪, ৯৭৩৫০৭৮৯৮০।

চালসা পোলো ক্লাব

শীতের একবেলা চালসা পোলো ক্লাবে

সত্যম ভট্টাচার্য

২০১৭ সালের গ্রীষ্মকালের এক বিকেলের কথা মনে পড়ছিল। জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে চলতে চলতে বারবার মনে হচ্ছিল এতো অনেকটা আমাদের ডুয়ার্সের মতই। পরে যখন পহেলগাঁও বা ওইরকম কিছু জায়গায় গেলাম, মনে হয়েছিল ভূস্বর্গ ভূস্বর্গের মত হলেও ডুয়ার্সের সাথে মূল পার্থক্য পাইন ফার ঘেরা জঙ্গলের মাঝে দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো উঁচু নিচু জমি। সেই থেকে কেবল ভেবে চলেছি এই রকমের ল্যান্ডস্কেপ কি আমাদের ডুয়ার্সে কোথাও নেই? কোথাও নেই খোলা আকাশের নীচে এমন

খোলা জায়গা যেখানে নিজের কাছেই নিজে হারিয়ে যাওয়া যায়? যেখানে একদম একান্তে বসে পাওয়া যায় নদীর জলের আওয়াজ বা পাখির ডাক।

মানুষ তো বরাবর স্বপ্ন দেখে। তাই বীভৎস ২০২০-র করোনাকাল কাটিয়ে ২০২১-এর প্রথম থেকেই সে চেষ্টা করছে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর। ডুয়ার্সে এই সময়টি চড়ুইভাতির মরশুম। দলে দলে লোক শহর গ্রামগঞ্জ মফস্বল থেকে গাড়ি ভাড়া করে একদিন চলে যায় পাহাড়-জঙ্গল নদীর মাঝে সময় কাটাতে। সেখানেই সেদিন খাওয়াদাওয়া-রান্নাবাড়ি-খেলাধুলা করে সময় কাটানো।

আমাদের যদিও অত দূরে যাওয়া হয় নি, কিন্তু ২৩শে জানুয়ারি দিনটি আমরা বন্ধুরা ছোট ভাইদের নিয়ে মজা করেই চড়ুইভাতি করেছিলাম জলপাইগুড়িতে তিস্তার ধারে।

পরদিন ২৪শে জানুয়ারি, রোববার। বিছানায় শুয়েই শুনতে পেলাম বাড়ির সকলে মিলে আউটিংয়ের প্রোগ্রাম করছে। সেখানে আমি শুধু নিতান্ত গাড়ির চালক, তার ওপর আগের দিন নিজে পিকনিক করে এসেছি। তাই হাজার ইচ্ছে না থাকলেও যেতেই হবে বুঝতে পারলাম।

পাহাড়পুর পেরলেই নতুন হাইওয়ে। চলতে শুরু করলেই ডানা মেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই যাত্রায় বেশিদূর ডানা মেলে এগোনোর অবকাশ পাওয়া গেলো না। তিস্তার নীল জল আপাতত ঢেকে আছে ধুলো এবং গাঢ় কুয়াশায়। সেখান থেকে সামান্য এগিয়েই দোমোহানি মোড় থেকে বাঁ দিকে। রেলের আন্ডারপাস পেরিয়ে তিস্তার পাশেই গড়ে উঠেছে বেশ কিছু চা-কফি মোমো ওমলেটের দোকান। ইচ্ছে থাকলেও বেলা বেশ খানিকটা গড়িয়ে যাওয়ায় আমাদের আর সেখানে দাঁড়ানো হলো না।

গতবার আলুর ভাল দাম পাওয়াতে গ্রামে গ্রামে এখন যতদূর চোখ যায় আলুর চাষ। এভাবেই পেরিয়ে যেতে লাগলাম সিংগীমারী, বাসুসুবা, মৌলানী, ক্রান্তি— যাবতীয় এলাকা। লাটাগুড়ি বাজার থেকে সামান্য এগোনোর পরেই শুরু হচ্ছে রেলওয়ে ফ্লাইওভারের কাজ। ফলে সেখানে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

জঙ্গল পেরিয়ে এলাম। মহাকালেও দাঁড়ালাম না। তখনও কিন্তু ঠিক করা হয় নি আমরা কোথায় যাচ্ছি। সাধারণত মূল রাস্তা থেকে যে সরু রাস্তাটি ধুপঝোরা হয়ে মূর্তির দিকে চলে যায়, সে রাস্তা দিয়ে এগোতেই

তিস্তার পাড়ে চড়ুইভাতি

উপর থেকে নীচের পেরিয়ে আসা জঙ্গল দেখে পাঁচতারা সিনক্লেয়ার্সকে বাঁ হাতে রেখে কিলকট এবং আইভিল বাগানের মাঝের সরু রাস্তার ওপর শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলোর নীচ দিয়ে এগোতে এগোতেই হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা চালসা চা-বাগানে পোলো ক্লাব দেখতে গেলে কেমন হয়। এ জায়গাটি আমাদের সকলেরই না দেখা। ডুয়ার্স প্রেমিক ধ্রুবদা আড্ডায় ডুয়ার্সের গল্প উঠলেই এ জায়গাটির কথা খুব বলেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। মূল রাস্তা ছেড়ে চালসা চা-বাগানের সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকে গেলাম ভেতরে। আঁকাবাঁকা সুন্দর পথে দু'দিকে চা-বাগান। একবার পথ নিচু হচ্ছে। নদী পেরোচ্ছি। আবার খাড়া পথে উঠে আসছি উপরে। দু'দিকে যতদূর চোখ যায় চা-বাগান। শীতকাল বলে তাদের পাতা ছাঁটা হয়েছে। ফ্যাক্টরির আগে যেখানে রাস্তা দুই ভাগ হয়ে, একটি চলে গেছে পোলো ক্লাবের দিকে, আরেকটি ফ্যাক্টরিতে, সেখানে বাগান রক্ষী আমাদের আটকে দিয়ে জানালেন পোলো ক্লাবে যাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন তাকে আমরা আশ্বস্ত করলাম যে আমরা পিকনিক করতে আসি নি, কেবল ঘুরতে এসেছি, তিনি অনুমতি দিলেন যাবার। এবারে সরু রাস্তার পথনির্দেশ ধরে আমরা পৌঁছলাম চালসা পোলো ক্লাবের সামনে।

ধারণা না থাকলে যা হয় আর কী! ভেবেছিলাম আমরা বেশি অভ্যস্ত। কিন্তু এই যাত্রা মন অন্য কথা বলল। গাড়ি এগোলো সোজা শাল সেগুন ঢাকা মখমলি রাস্তা ধরে চালসা গোলাই-এর দিকে।

গোলাইয়ে ট্রাফিক সামলাচ্ছিলেন এক অত্যন্ত স্মার্ট পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহিলা কর্মী। তিনি যখন 'গো-ও' বলে এগোনোর নির্দেশ দিলেন, খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, কোনদিকে যাব বুঝতে না পেরে

পাঁচতারা সিনক্লেয়ার্সকে বাঁ হাতে রেখে কিলকট এবং আইভিল বাগানের মাঝের সরু রাস্তার ওপর শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলোর নিচ দিয়ে এগোতে এগোতেই হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা চালসা চা বাগানে পোলো ক্লাব দেখতে গেলে কেমন হয়। এ জায়গাটি আমাদের সকলেরই না দেখা।

গাড়ি নিয়ে সোজা উঠে এলাম আপার চালসার দিকে। বহু পুরনো পূর্ত দপ্তরের বাংলোকে বাঁ দিকে রেখে গাড়ি খাড়া পথে গিয়ে দাঁড়াল ভিউ পয়েন্ট এর পাশে। চা খেলাম।

শতাব্দী প্রাচীন একটি ক্লাবের সামনে হয়ত খানিক ফাঁকা জায়গা থাকবে। সেখানে গাছগাছালির মধ্যে বসার ব্যবস্থা থাকবে। গিয়ে দেখলাম সে তো আছেই। কিন্তু তারও পরে চোখ চলে যাচ্ছে এক দিগন্ত বিস্তৃত পরিসরের দিকে। কয়েকটি বাচ্চা ছেলে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করাতে বলল ওদিকেই নাকি আসল ঘোরার জায়গা।

এগোতে এগোতে ভাবছিলাম এই কি সেই জায়গা, কাশ্মীর থেকে আসার পর ডুয়ার্সের কোথাও নেই ভেবে যা নিয়ে মন খারাপ করতাম? দেখলাম অতটা না হলেও এখানেও সেই অল্প ঢেউ খেলানো দিগন্ত বিস্তৃত জঙ্গল ঘেরা প্রান্তর।

কিন্তু মূল সমস্যা এখানেই যে প্রকৃতি আমাদেরকে উজার করে দিলেও আমরা অনেক সময়ই তা ধরে রাখতে পারি না। যেমন এই যে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠটি, একসময় বাগানের ইউরোপিয়ান সাহেবরা এখানে পোলো খেলতেন, তার সবুজ মখমলের মত ঘাসই হতে পারত এখানকার ইউএসপি। কিন্তু শীতের কারণে হোক বা ঘাস মারার তেল ব্যবহার করার কারণেই হোক, সে ঘাসজমি এখন হলুদ বিবর্ণ। তবু একটি বিষয় ভালো যে বাগান কর্তৃপক্ষ এখনও জমিটিকে বেসরকারি হাতে দিয়ে দেন নি। তাই এখনও বাগানের লোকেরা বা সাধারণ ডুয়ার্সের ভ্রমণপিপাসু লোকেরা গিয়ে এই মুক্ত পরিধিতে খোলা আকাশের নিচে শ্বাস নিতে পারছে।

শোনা যায় আনুমানিক ১২০ বছর আগে যখন ডুয়ার্সে ব্রিটিশ উদ্যোগে গড়ে উঠছে একের পর এক চা-বাগান, তখন ইউরোপিয়ান সাহেবরা সপ্তাহান্তে নিজেদের অবসর বিনোদনের কথা ভেবে এই অল্প ঢেউ খেলানো জমিটিকে বেছে নিয়েছিলেন পোলো ক্লাব করার জন্য। ভাবলে রোমাঞ্চ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যে এখানেই একদিন সাহেবরা তাদের ছুটির দিনে সাদা কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে পোলো খেলতেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলকে ব্যবহার করা হয়েছিল ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে।

ধীরে ধীরে দুপুর পেরিয়ে বিকেল নামছিল। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গাড়িতে করে আমরা সেই তেপান্তরের মাঠের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এক পাশের মূর্তি নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল ময়ূরের ডাক। আরেক পাশের নদীর ওপারে ধাপে ধাপে উঠে গেছে চা-বাগান। দিনের কাজ শেষে সে অঞ্চলের বাসিন্দারা নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন নিজেদের বাড়ির দিকে। ক্লাবের সামনে ফিরে গাছগাছালিতে ঢাকা বসার জায়গাগুলিতে বসে থাকতে থাকতে কেবল মনে হচ্ছিল এবারে ভূস্বর্গের সাথে আমাদের ডুয়ার্সের ফারাক খানিক কমাতে পারলাম।

ডুয়ার্স ডে আউট। দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট

সৌম্যব্রত রক্ষিত

ডুয়ার্সের সৌন্দর্য বোধহয় শেষ হবার নয়। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, ঝোড়া, বন্যপ্রাণ দিয়ে শোভিত ডুয়ার্স যেন এক ডাকসাইটে সুন্দরী। জলপাইগুড়ির মানুষ তাই সুযোগ পেলেই পরিবার বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো এক মজ্জাগত অভ্যাস।

ডুয়ার্স নিয়ে একটা কথা চালু আছে, যেখানেই দাঁড়ানো যায় সেখান থেকেই ভাল লাগা শুরু, যেন তার শেষ নেই।

একটা সপ্তাহান্তে রওনা ঝালং-এর উদ্দেশে। লাটাগুড়ি, গরুমারা, মুর্তিনদী, চাপরামারি অভয়ারণ্য পেরিয়ে যেন স্বপ্নের যাত্রা। সবুজে ঘেরা দীর্ঘ এক বন্য সুন্দর রাস্তা। রাস্তার পাশে ছোট ছোট জনপদ। অল্প কিছু ছোট ছোট বাড়ি, গবাদি পশু আর অল্প কিছু মানুষ যেন এক একটা 'পিকচার পোস্টকার্ড'। জলঢাকা নদীকে ডান হাতে রেখে গাড়ি এগিয়ে চলল। পথে একটু দাঁড়ানো হল একটা গ্রামে ঝালং এর আগে রাবার প্রকল্পের পাশে। রাবার গাছের সারি ও তরুছায়া যেন স্নিগ্ধ সুন্দর ভাললাগা। এরপর বিকেল বিকেল পৌঁছানো গেল ঝালং-এর একটা রিসর্টে। লোকেশন

খুব সুন্দর। ঢোকার মুখে ছোট্ট একটা জলের ধারা, তার ওপর ছোট্ট সাঁকো। আর অন্য পাশে জলঢাকা নদী তার উপর উঁচু ভুটান পাহাড়। রিসর্ট থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পশ্চিম পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখা আর রাতে জমিয়ে আড্ডা সহকারে ডিনার সেরে জলঢাকার গর্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়িচালকের সাথে গন্তব্য নিয়ে অনেক আলোচনার পর স্থির হল বিন্দু 'জলঢাকা জল বিদ্যুৎ প্রকল্প', তারপর নাম না জানা একটা জায়গায় যাওয়া হবে।

সবার মনে দ্বিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত রওনা বিন্দুর উদ্দেশে। রাস্তা খুবই সুন্দর। অনেকবার আসা হলেও প্রতিবার যেন আরও আরও নতুনের সমারোহ। বেশ কিছু পাহাড়ি ঝরনা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত জলঢাকার তুমুল গর্জন...জলঢাকা জল বিদ্যুৎ প্রকল্প। নদীর ওপারে ভুটান। যাওয়া আসা নিষেধ। পাওয়া যায় ভুটানের চকলেট সহ অন্যান্য ডেয়ারি প্রডাক্ট। ঘণ্টাখানেক জলঢাকার গান ও ঘ্রাণ উপভোগ করে ফেরা।

ফেরা সেই চেনা পথে। ঝালং পেরিয়ে কিছুটা আসার পরেই সোজা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের একটা উঁচু রাস্তা ধরা হল। সবার মনে একটাই প্রশ্ন কে জানে কেমন হবে! এই ভাবতে ভাবতে গৌরিবাস নামে একটা গ্রাম পেরিয়ে এসে রাস্তার বাঁকে দাঁড়ানো হল। সমতল থেকে অনেকটা উঁচু। নীচে গোটা চাপরামারি জঙ্গলটাকে দেখা যাচ্ছে। যেন তার কোনও শেষ নেই। এইভাবে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছালাম জঙ্গল ঘেরা সমতল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। জঙ্গলের নাম 'রঙ্গো বনাঞ্চল'। সিনকোনা সহ বহু ভেষজ উদ্ভিদের বন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী ডা.মনমোহন সেন ছিলেন রংপু সিনকোনা প্লান্টের ডাইরেক্টার এবং হেড কেমিষ্ট। তার তত্ত্বাবধানে এই বনাঞ্চলের সিনকোনা গাছের ছাল ওই প্ল্যান্টে যেত এবং এখানেই সেই ম্যালিরিয়া রোগের ঔষধ কুইনাইন তৈরি হত। ডা.রোনাল্ড রস যিনি এই কুইনাইন তৈরি করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনিও এই অঞ্চলে বেশ কয়েকবার এসেছেন। এই অভিঘাত বিচার করলে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম, যা ইতিহাসের অতলে তলিয়ে গেছে।

বেশ একটা নির্জন পরিবেশ। ওখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটাপথ পেরিয়ে অবশেষে 'দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট'। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৫০০ ফুট।

অসামান্য প্রকৃতির সৃষ্টি। অসাধারণ মুগ্ধতা। অনেকগুলো ওয়াচটাওয়ারের মধ্যে একটাতে উঠে বসা হল। বেশ শীত শীত ভাব। সামনে আরেকটা খাদ। সামনের দিকে খাদের ওপারে নীচে ঝালং। বাঁ দিকে

দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে ভুটান পাহাড়

প্যারেন ভ্যালি। প্যারেন গ্রামে যেন সবুজের উৎসব চলছে। নীচে সরু সরু রাস্তা, গাড়িগুলো যেন এক একটা দেশলাই বাক্স। নীচে অনেকটা দূরে জলঢাকা নদী। যে নদীর গর্জন কানে তালা লাগিয়ে দেয় সারাদিন সারারাত, তার অন্য আরেক রূপ। দূর থেকে মনে হচ্ছে কী শান্ত, কী অসম্ভব স্থির এক জলধারা বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে। ডানদিকে জলঢাকার ওপরের পাহাড়ে ভুটানের ছোট্ট শহর ‘শিবচু’। অসামান্য এক প্রকৃতির খেলা, এই ওপর থেকে যা খুলে গেল উড়িয়ে দেওয়া ওড়নার মত, সীমাহীন এই ক্যানভাস কত কত দূরের দিকে চলে যাচ্ছে আপন খেয়ালে, নিজের মর্জিমত। এখানে শুধু স্বাধীনতা আর কল্পনার মেলবন্ধন। ভাবতে ভাল লাগে আমি এই অপরূপ পৃথিবীর একটা অংশ। একটা মানুষ যার চোখ দিয়ে দেখলে স্বর্গও হয়ত কম ভাবা হবে। যার কোনও জরিপ লাগে না, শুধু ভালবাসা আর নিসর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার একটা চেষ্টা।

হঠাৎ সামনের ভুটান পাহাড়ে মেঘের খেলা শুরু হল। তারপর বৃষ্টি। দূর থেকে এক পাহাড় থেকে আরেকটা পাহাড়ের বৃষ্টি দেখা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তারপর ভুটান পাহাড় জুড়ে বিশাল এক রামধনু। তারপর আগে একটা রামধনু ওর সাথে সাথে, অবিস্মরণীয় এক মুহূর্ত যা দেখার জন্য দেখতে পাওয়ার জন্য নিজেকে শুধু ভাগ্যবানই মনে হয় না, মনে হয় এই বিচিত্র খেলা হয় কীভাবে? কে করে? কীভাবে এ-ও এ-ও রং খেলতে থাকে কার খেয়ালে? কাদের ইশারায়? মনে পড়ে গেল প্রকৃতির এই অসামান্য সৃষ্টি দেখে। তারপর অদ্ভুতভাবে পুরো খাদটায় মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। অল্প সময়ের মধ্যে ঝালং, প্যারেন, শিবচু, নীচের রাস্তা বাড়ি সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেঘ কেটে যেতেও বেশি সময় লাগল না। আবার সবকিছু ঝকঝকে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধুই মুগ্ধতা। আর মুগ্ধতা। ঘোরের মধ্যে কেটে গেল বেশ কিছুটা সময় যেন মুহূর্তের মধ্যে। সমাজবদ্ধ জীব বলে অবশেষে ফিরতে হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু মনটা পড়ে রইল ওদের কাছে। গুডবাই দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।

বাংলা ভাষার বীর ভূমি এপারের গ্রাম বাবলা

২৯ পাতার পর

নাকি হেসে বলতেন একদিন নিশ্চয়ই বুঝবি তোরা এর কারণ। বড় হয়ে জানলাম ‘এবিএম’ র অর্থ আবুল বরকত মুহাম্মদ। আমার বাবা নিজের সন্তানদের নামের মধ্যেও হয়ত শহীদ বরকতকে স্মরণ করতেন অথবা এইভাবেই হয়ত মাতৃভাষা ও ভাষা শহীদদের প্রতি তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন আমৃত্যু, আমরাও তাই করেছি, আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরও নামের আদ্যাক্ষর ‘এবিএম’। তিনি আরও জানালেন, বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিটে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন, পরে উপস্থিত অন্যান্যরা। পরদিন প্রত্যুষে বেরোয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কাতারে কাতারে মানুষ খালি পায়ে কালো পোশাকে পথ পরিক্রমায় শ্রদ্ধা জানায় বরকত, রফিক, জাব্বার, সালাম ও শফিউরকে। সারাদিন ধরে চলে মিলাদ মেহফিল, কোরাণ পাঠ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। ধরা গলায় তিনি বললেন বাংলাদেশী ভাই বোনেরা কিন্তু তাদের মাতৃভাষাকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন।

আর এপার বাংলার নব্য বাঙালিদের ক্ষেত্রে বুঝি এমন দাবি করা মুশকিল। পয়লা জানুয়ারি করে তারা নববর্ষের উদযাপন, বাংলা সাল আর তারিখের বিস্মরণ ঘটে প্রায়শই, একটা বাংলা বাক্য লিখতে বা বলতে গিয়ে অন্তত চারটে ভিন্ন ভাষা বিশেষত ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে, ইংরাজি অক্ষরে বাংলা লিখে আত্মশ্লাঘা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানায়, একসময় আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা থেকেই ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলশ্রুতিতেই

বাবলা গ্রামে শহীদ দিবস স্মরণ

পাঁচ শহীদ বরকত, রফিক, জাব্বার, সালাম ও শফিউর

ভবিষতে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে যার রাষ্ট্রভাষা হয় 'বাংলা'। আমরা এটাও হয়ত জানি বাংলা হল বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম এবং পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্ট ভাষা, তবুও আমরা ভুলতে বসেছি মায়ের ভাষাকে, ভুলতে বসেছি সেই ধ্রুবসত্য, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। তাই আরও একটা ভাষা আন্দোলনের আশু প্রয়োজন বোধহয়। প্রয়োজন অন্য ভাষার প্রভাব থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে, বাংলা যে বাঙালির আপনজন সেটা নব্য প্রজন্মকে বোঝাতে এবং অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলার যে প্রকৃতই কোনও বিরোধ নেই তাও অনুধাবন করাতে। এরজন্য চাই বরকত, রফিক, সালামের মত বাঙালির, মাতৃভাষা যাঁদের প্রাণাধিক প্রিয়। পিয়াস মজিদ যথার্থই বলেছেন '১৯৫২ সালে বাংলাভাষার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক, প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষিত পালটেছে হয়ত, কিন্তু আন্দোলনের প্রয়োজন পাল্টায় নি'।।

ধারাবাহিক উপন্যাস। দশম পর্ব

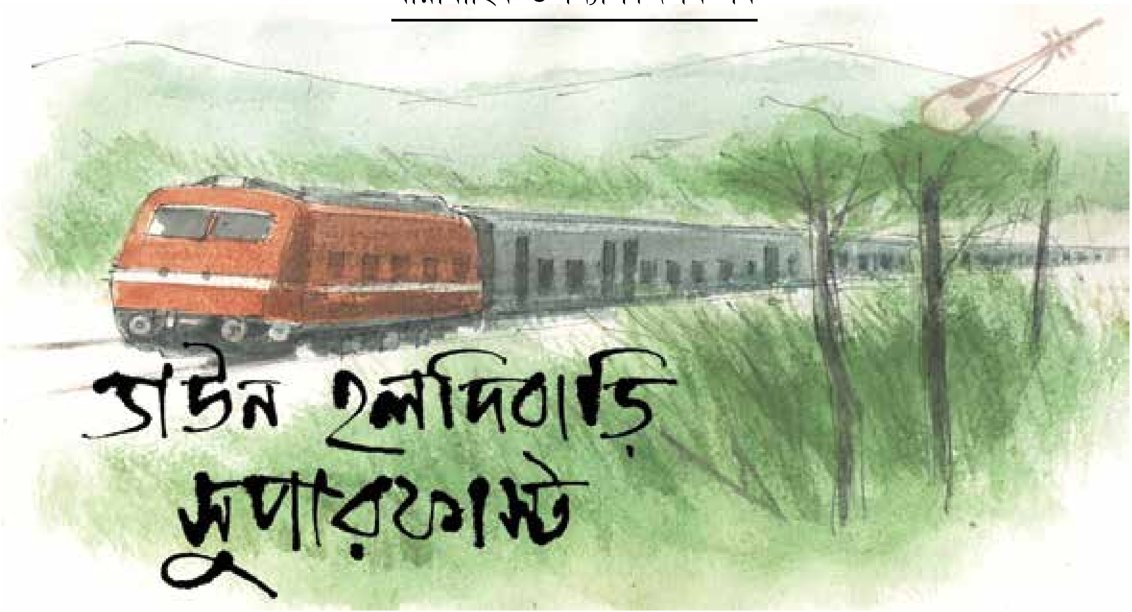

সুজিত দাস

ধাঁধার ভেতর পড়ে আছে সৌরভ। রাঙ্গাপানির 'গ্লোবাল কেমিক্যালস-এর বিস্ফোরণ, চম্পাসারির ট্রাক লুঠ কিংবা তক্ষক উদ্ধারের জন্য রেইড। সবটাই একটা বিনিসুতোর মালা যেন। মিলন গোম্বু, প্রশান্ত কর, বাটা সুভাষ সবাই কোথাও না কোথাও গাঁথা আছে একটা ডটেড লাইন বরাবর। এই জটিলতার মধ্যে ভগবান দাস দেখা করল তেজেন ডাক্তারের সাথে এবং চিকা বিশুকে আসতে হলো কবিতার আসরে। তারপর ?

১৯

মিষ্টির মজাটা এইখানেই।

গিলে ফেলার পরেও জিভ, গলা আর মাথার ভেতরে সোয়াদটা রয়ে যায়। বেলাকোবার বিখ্যাত চমচম অনেকবার খেয়েছে ভগবান। তবে বানারহাট চৌপথীতে এলেই রক্তের ভেতরে চিনি কমে যায়, মনটা আনচান করে, পা এবং মাথা নিয়ে যায় লছমি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। চেনা মালিক, চেনা বেয়ারা, চেনা টেবিল। আয়েস করে বসে ভগবান। কোনও অর্ডার ছাড়াই স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে দু'টো চমচম চলে আসে। আহ্। এইসব ছোটখাট সুখ আছে বলেই বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের।

মধুপুর থেকে লোকাল বাসে বানারহাট। এরপর ছোটা হাতি ধরে জামবাড়ি টি-এস্টেট। জার্নি বলে

জার্নি! লোকাল বাস, কয়েক মিনিট পরপর স্টপেজ। তবে ভগবানের তাতে কোনও চ্যাদভ্যাদ নাই। মানুষের মুখ দেখেও অনেক সুখ জীবনে। সুর বাদ দিলে এই একটা জিনিস মাথায় গেঁথে যায়। কোনও ভুলচুক নাই। মুখের আদল, চোখের চাউনি, চোয়ালের গড়ন... একবার দেখলে মাথার কোথায় যে ঢুকে যায়! বেহালাবাদক ভগবান দাস মস্তিস্কের খাঁজে খাঁজে কত মুখ যে ধরে রেখেছে প্রিন্ট না করা নেগেটিভ রোলের মত। ভগবানের এ এক আজব মেমোরি কার্ড। এত মুখের সফট কপি মাথার ভেতর।

মালবাজারেই নেমে যেতে পারত ভগবান।

কিন্তু কখন কোথায় কার সঙ্গে কথা বলা দরকার এটা কীভাবে যেন সংকেত পেয়ে যায়। ওর মন বলছিল তেজেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবার জন্য একটা খোলা জায়গা দরকার। প্রুন করা চা-পাতার গন্ধ, কুলিকামিনদের কথাবার্তা, শেড-ট্রির আলোছায়া... এমত আবহেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বড় ভাল মানুষ, সারাটা জীবন এই ডুয়ার্সের মায়ায় কাটিয়ে দিলেন। নাড়ি টিপে রোগের চিকিৎসা করে গেলেন এতটা দিন। কলকাতা ছেড়ে, বাকি দুনিয়া ছেড়ে এই জল-জঙ্গলের মধ্যে একটা গোটা জীবন প্রায় কাটিয়ে দিলেন। ভাবা যায়!

জামবাড়ি টি-এস্টেটের একটু আগেই ছোটা হাতি থেকে নেমে পড়ে ভগবান। একটু হাঁটনের দরকার। হাঁটলে মাথা খোলে, সুর খেলা করে। শরীল ভাল থাকে। রেডব্যাঙ্ক বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোতে থাকে ভগবান। জামবাড়ি দিশি ভাটির সামনে আরাম কেদারায় বসে তারক ব্যানার্জি। ভাটির মালিক। ভগবানকে দেখে তারক ওর হেলান দেওয়া শরীর ঈষৎ সোজা করে,

'মাস্টার, পথ ভুল করে এদিকে হঠাৎ?'

'এই এমনি তারকদা, মনে হল একটু অক্সিজেন নিয়ে আসি।'

'বেশ, বেশ। ভাল করেছিস মাস্টার। তা শুধুই অক্সিজেন নিবি না একটু জল টলও খাবি?'

'আজ্ঞে তারকদা, সে তো বটেই', মিহি হাসে ভগবান, 'তবে ফেরার পথে। একটু কাজ আছে বাগানে।'

'কাজ করে ফেরার পথে এখানে একটু আসিস। এইট্টি আপ। যা চাই, পেট ভরে। কাজ আছে।'

'একদম দাদা।'

জামবাড়ি বাগানের অফিস চত্বরটি বেড়ে সাজিয়েছেন বিল্বমঙ্গল রায়।

একদিকে বাগানিয়া বাবুদের অফিস বিল্ডিং অন্যদিকে কারখানা। মাঝে সবুজ লন। কোণের দিকে তেজেন ডাক্তারের বিরাট চেম্বার। কোথাও একটা গাছের পাতা পড়ে নেই, মরা ঘাস নেই। পরিপাটি, নিখুঁত। রইসি চাল আছে বটে বিল্বমঙ্গলবাবুর। গ্যারাজ ভর্তি গাড়ি তবু এই বয়েসেও রয়্যাল এনফিল্ড দাপিয়ে ঘুরে বেড়ান। ডাক্তারের চেম্বারে কয়েকজন রোগী। ভগবানের জীবনে কোনও তাড়া নেই। সামনের বেঞ্চে বসে চোখ বন্ধ করে আকাশ পাতাল ভাবে। ভাবতে বসার মধ্যেও একটা খেলা আছে। হাঁটনের মত ভাবনারও কত যে সুতো, কত মারপ্যাঁচ! কত রাজপথ, কত গলি-কানাগলি-চোরাগলি! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে একসময়। স্বপ্নে দ্যাখে বিরাট একটা মাঠ। লোকে লোকারণ্য। একদিকে মঞ্চ। মঞ্চের ওপর একটি অল্পবয়েসি মেয়ে। হাজার হাজার মানুষ পুতুলের মত হাসছে, কাঁদছে, হাততালি দিচ্ছে মেয়েটির কথায়। মেয়েটির মুখের ডৌল পানপাতার মত। সামনে ঝিঙে বিচির মত মাইক্রোফোন।

'ভগবান, এই ভগবান', চেহারার মতই তেজেন ডাক্তারের হাতের পাঞ্জা খুব শক্তপোক্ত।

'ঘুমের আর মা বাপ নাই, ডাক্তারবাবু', কাঁচা ঘুম ভেঙে আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় করে ভগবান।

'হয়েছে, হয়েছে। এই বয়েসে যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তে পারিস, আর কী চাই তোর?' হেসে ওঠেন তেজেন ডাক্তার, 'আয়, ভেতরে আয়।'

তেজেন ডাক্তারের ঘরটা দেখলে ডাক্তারের চেম্বার বলে মনে হয় না। পাশের ঘরে ওষুধ নিয়ে কমপাউন্ডার। এই ঘরে শুধু বই আর বই। এককোণে একটি টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলে দাবার বোর্ড। হাতির দাঁতের রাজা, মন্ত্রী, নৌকা, বোড়ে। রায়বাবুর বাড়িতেও দাবার বোর্ড। এই দুই বন্ধু মিলে নিজের কাজের সময়টুকু বাদ দিলে দাবাই খেলে যাচ্ছেন গত চল্লিশ বছর। বাগানের মালিক কিংবা

ডাক্তারের সম্পর্ক নয়। দুজনেই হরিহর আত্মা। ডাক্তার কলকাতা থেকে সেই যে এসেছিলেন এমবিবিএস পাশ করে আর ফিরে যান নি।

চা আসে সাদা ফিনফিনে কাপে। পাতলা লাল রঙের চা।

'এই ফিকা চা কী করে খান, ডাক্তার? আমার তো দুধ-চিনি দিয়ে বেশ গাঢ় একটা চা ভালো লাগে', হাসতে হাসতে বলে ভগবান।

'আরে তুই শিল্পী মানুষ, তোর কথাই আলাদা। নে, খা। বাগানের সেরা প্লাক এটা।'

একমনে চায়ে চুমুক দিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকায় ভগবান। ওপরের কড়ি বরগার দিকেও। ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই অফিস। পরে বিল্বমঙ্গল রায় নিজের মত করে অনেকটা বাড়িয়েছেন এই বাগান এবং দরদালান। তবে বিলাতি ঢং-এই যা কিছু করার করেছেন। দেওয়াল জুড়ে পুরনো আমলের কত ফটো। যৌবনের তেজেন ডাক্তার একেবারে সাহেবদের মতই দেখতে। যেমন গায়ের রং তেমনই চেহারা। ডাক্তার আর রায়সাহেবের একটা পুরনো ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ভগবান। দুজনের হাতেই বন্দুক। পায়ের নীচে একটা চিতা।

'ডাক্তার, মানুষখেকো চিতাটা তো আপনিই মেরেছিলেন সেদিন। উফ কতদিন আগেকার কথা! আমিও ছিলাম এখানে। সে এক মস্ত ব্যাপার বটে। মরার আগে অনেককে মেরে মরেছে চিতাটা', বহুদিন আগের কথায় ফিরে যায় ভগবান।

'শোন, গুলি আমরা দু'জনেই চালিয়েছিলাম। দুটো গুলিই চিতাটার গায়ে লেগেছিল। তাই শুধু আমিই মেরেছিলাম, এটা বলা ঠিক নয়।'

'ঠিক, ঠিক। রায়সাহেবও তো নামকরা শিকারি।'

চা খেতে খেতে নানান এলোমেলো কথা হয় দুজনের। ডাক্তারের টেবিলে একটি তরুণীর ছবি দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে ভগবান, 'রাধারানি দিদির বক্তৃতা শুনলাম কয়েকমাস আগে, মধুপুরে। আহা মন ভরে গেল ডাক্তার। কী আওয়াজ, কী গায়ের রং! আর তেমনই তার বাণী ডাক্তার। মানুষ একেবারে পাথর হয়ে শুনতে থাকে।'

'সুহাসিনী আর বিল্বমঙ্গলের মেয়ে তো এমনটাই হবে ভগবান। এত ভাল আর উদার যার বাপ-মা, সে সমাজের জন্য কাজ করবে না কে করবে, বল?'

'বটেই তো। বটেই তো। ছোটবেলা থেকে আপনাদের মত তিনজন মানুষের ছায়ায় যে মানুষ হবে সে তো দেশ আর দশের কাজ করবেই।'

'তা হঠাৎ এদিকে কী মনে করে ভগবান?'

'সেদিন দিদিভাইকে মধুপুর স্টেডিয়ামে দেখার পর থেকেই আপনাকে দেখতে বড্ড মন করছে ডাক্তার। কতদিন দেখি না আপনার মুখটাও।'

'তুই তো একবার দেখলে কোনও মুখ ভুলিস না ভগবান।'

'সেই তো যত নষ্টের গোড়া, ডাক্তার', আক্ষেপের সুরে স্বগতোক্তি করে বেহালাবাদক।

'শোন ভগবান, তুই সুরের রাজ্যে থাকিস। বিয়ে থা করিস নি। ঠিক আমারই মতো। এভাবেই থাক, সংসারে অনেক চোরাকুঠুরি থাকে। ওসবের ভেতরে কত সোনাদানা, কত লুকনো কথা। কত দুর্বলতা, কত মন দেওয়া নেওয়া। ওসব নিয়ে আমাদের ভাবলে চলে?'

'নিখাদ কথা, ডাক্তার। আমি শুধু একবার আপনের মুখটা ঝালাই করে নিতে এসেছি।'

'শোন, তোকে একটা জিনিস দেবো ভগবান। জরুরি। রাধারানির হাতে পৌঁছে দিতে হবে, বুঝলি?'

'কোথায় ডাক্তার? জিনিসটা কি খুব দামি কিছু?'

'কোথায় তোকে জানতে হবে না। রাধু তোকে খুঁজে নেবে। আর কাগজটা তুই যত্ন করে রাখিস। কিছু না বলেও অনেক কথা বলে দিতে পারিস তুই। তোকে ভরসা করা যায়। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সময় বোধহয় হয়ে এল'

'ওইসব কু-কথা মুখেও আনবেন ডাক্তার। কতই বা বয়েস আপনের?'

'আমি ডাক্তার, মৃত্যুর হাতছানি ভগবানের থেকেও আগে টের পাই', হেসে ওঠেন তেজেন, 'সাবধানে ফিরিস।'

একটা খাম ব্যাগে ভরে নিয়ে ফেরার রাস্তায় পা বাড়ায় ভগবান।

জামবাড়ি ভাটির সামনে মদের পাইকার, কুলিকামিন একেবারে মাছির মত ভনভন করছে।

মালিক তারক ব্যানার্জি বেশ শৌখিন মানুষ। দুটো ময়ূর পুষেছেন। ময়ূর দুটো ছাড়াই থাকে সবসময়। আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলেও কোনওদিন অন্য কোথাও উড়ে যায় নি। শোনা যায় সন্ধ্যাবেলা দুটো ময়ূরকেই খানিকটা এইট্টি আপ খাওয়া শিখিয়েছেন তারক। এও শোনা যায় নিষিদ্ধ তরলে ময়ূরের নেশা হয় এবং রাতের দিকে ঘন ঘন কেকাধ্বনি শোনা যায়।

তারক এখনও আরামকেদারায় বসে। ফর্সা গাল রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। পরনে ট্র্যাকস্যুট মুখে গোল্ডফ্লেক লাইট, কিংসাইজ। হাতছানি দিয়ে ভগবানকে ডাকে তারক,

'তোর জন্যই বসে আছি রে, ডাক্তারের সঙ্গে এত কীসের আলাপ?' হাঁক পাড়ে তারক ব্যানার্জি, 'শম্ভু, অ্যাই শম্ভু, চেয়ার নিয়ে আয় একটা।'

শম্ভু চেয়ার, গ্লাস আর এক বোতল এইট্টি নিয়ে আসে। সঙ্গে মাংসের ছাঁট দিয়ে বানানো চাট। এই এইট্টি ডিগ্রি আপ মদ একটা আজব জিনিস! লুকসান ফ্যাক্টরি থেকে ড্রামে করে মদ নিয়ে আসে দোকানদারেরা। দুষ্ট লোকেরা বলে তারপরেও নাকি খানিকটা জল মেশানো হয় খুচরো বিক্রি করার আগে। এতকিছুর পর মদে আর তেমন ধক্ থাকে না। তবে বাগানিয়া গরীব মানুষেরা মদ বলতে এই এইট্টিই বোঝে। অনেকদিন বাদে এই হালকা মদে চুমুক দেয় ভগবান,

'তারকদা, আংটি কি আরও বেড়ে গেছে নাকি আপনার আঙ্গুলে?'

'আর বলিস না, ছোটমেয়ের বিয়ের সময় আরও একটা পরিয়ে দিল তোর বউদি।'

'বেশ করেছেন দাদা, এত গ্রহ-নক্ষত্র আকাশে, আংটি বেশি না হলে সামলাবেন কী করে?'

'সবমিলিয়ে তেরোটা হল রে ভগবান। আর একটা নিতে হবে। তেরো একটা অপয়া সংখ্যা।'

'অসুবিধে হয় না দাদা?'

'হয় না আবার? বাথরুম যাওয়ার আগে খোলো রে, স্নানের সময় খোলো রে। হ্যাপার কি অভাব আছে কিছু?'

'তবে সুবিধাও তো অনেক দাদা। অশুভ দৃষ্টি আপনার ওপরে পড়বে না। কান্নিক মেরে অন্য পানে চলে যাবে।'

'অসুবিধের কথা শোন তবে। সেবার কাজাখস্থান যাওয়ার পর এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনের মেয়েছেলে পুলিশ আমাকে আটকে দিল এই আংটি আর পাথরের জন্য।'

'তারপর, তারপর?', ভগবানের মাথা হালকা হয়ে এসেছে দু'বোতল এইট্টির গুণে।

'আমি তো ভালো ইংরাজিও জানি না। ইংরাজির ভয়ে বেশি দূর লেখাপড়াও করি নি।'

'তাহলে কী হল তারকদা?'

তারক ভগবানকে ওর কাঠের দোতলা ঘরে নিয়ে আসে। দুজনে একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া খায় অবেলায়। ফেরার আগে তারক ব্যানার্জি একথোকা একহাজার টাকার লাল নোট বের করে সিন্দুক থেকে। 'তিন লাখ আছে, ভগবান। মধুপুরে গিয়ে আজই মংরার হাতে তুলে দিবি। এই ব্যাগটায় ভরে নে। ওপরে কয়েকটা এইট্টির বোতল নিয়ে নিস। অবশ্য তোকে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কী আবার হবে। ভেতরের ঘরে আরেক মেয়েছেলে অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। কী তার রূপ! বুকের ওপর কত মেডেল!'

'মেয়েছেলের বুকে মেডেল তো খুবই অশৈলী ব্যাপার, দাদা', নেশা ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে ভগবানের, 'কীভাবে উদ্ধার পেলেন?'

'ওই ইংরাজি। ইংরাজি বললাম।'

'কী বললেন, শুনি শুনি।'

দশটা আঙুল ওই মেয়েছেলে পুলিশটার চোখের সামনে নাচিয়ে বলে দিলাম, 'গ্রহ ম্যাডাম, দিস ইজ

অল গ্রহ, গ্রহের ফের', তারপরে আরেকটা লাইন যোগ করে দিলাম। মোক্ষম লাইন।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, মাল পঞ্চায়েতের প্রধান রাম দাস সব সালিশি সভার শেষে এই লাইনটা দিয়ে শেষ করত। একেবারে মোক্ষম লাইন। সব্বাই চুপ।'

'বলেন, বলেন আমিও শিখে রাখি।'

'আরেকবার দশ আঙুল নাচিয়ে বললাম 'মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড।'

'বাপরে দম আছে শব্দ গুলায়। গা টা কেমন গরম হয়ে উঠল তারকদা। মাথাটা বেশ ঝাঁকি দিয়ে দিলো মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমার মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড শুনে ওই বুকে মেডেলওলা মেয়েছেলে পুলিশ অফিসারের মুখে কী হাসি, কী হাসি। হাত মিলিয়ে ফেলল আমার সঙ্গে। কী মোলায়েম হাত রে ভগবান। পুলিশ বল আর মেলেটারি বল, মেয়েছেলের হাত পুরো মাখম।'

'আরিব্বাস', কাহিনি বটে তারকদা।'

জামবাড়ি বাগানে এখন শেষ বিকেল। ভাটিতে ভিড় আরও বাড়ছে। বাগানের কাজ সেরে আরও মানুষ দলে দলে আসছে দোকানের কাউন্টারে। তারক ভগবানকে ওর কাঠের দোতলা ঘরে নিয়ে আসে। দুজনে একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া খায় অবেলায়। ফেরার আগে তারক ব্যানার্জি একথোকা একহাজার টাকার লাল নোট বের করে সিন্দুক থেকে। 'তিন লাখ আছে, ভগবান। মধুপুরে গিয়ে আজই মংরার হাতে তুলে দিবি। এই ব্যাগটায় ভরে নে। ওপরে কয়েকটা এইট্টির বোতল নিয়ে নিস। অবশ্য তোকে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'আপনেও, তারকদা?'

'অনেক বয়েস হয়ে গেল রে ভগবান। সারজীবন ধরে মদে জল মিশিয়ে গেলাম। এই একটা কাজ এখন মন দিয়ে করতে চাই। এরা সমাজের ভালো করার জন্য লড়ে যাচ্ছে। আমার আর কোনও পিছু টান নেই ভগবান। এদের সঙ্গেই থাকব বাকি জীবনটা।'

'তাহলে এতগুলো আংটি? এগুলোর কী হবে?'

'গ্রহ ভগবান, দিস ইস অল গ্রহ, গ্রহের ফের।'

গ্রহের ফেরই বটে। রাধারানি আর তেজেন ডাক্তারের মুখটা মিলিয়ে নিয়েছে ভগবান। এটুকুই কাজ ছিল। অথচ ফেরার পথে ব্যাগের ভেতর শুয়ে আছে তেজেন ডাক্তারের উইল আর তিনলাখ টাকা। 'কোড গ্রিন'-এর সম্পত্তি পিঠের ওপর নিয়ে ছোটা হাতির জন্য অপেক্ষা করে ও।

আজ আর এই ফাঁকা রাস্তায় হাঁটনের দরকার নেই।

২০

এই নতুন পোস্টিং-এ আসার পর থেকেই একটা ধাঁধার ভেতর পড়ে গিয়েছিল সৌরভ। এমন একটা জটিল সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক যেটা সল্ভ করতে পারছিল না অথচ সূত্রটা হাতের কাছেই আছে বলে মনে হচ্ছিল। রাঙ্গাপানির 'গ্লোবাল কেমিক্যালস-এর বিস্ফোরণ, চম্পাসারির ট্রাক লুঠ কিংবা তক্ষক উদ্ধারের জন্য রেইড। সবটাই একটা বিনিসুতোর মালা যেন। মিলন গোম্বু, প্রশান্ত কর, বাটা সুভাষ সবাই কোথাও না কোথাও গাঁথা আছে একটা ডটেড লাইন বরাবর। প্রথম সন্দেহটা হয় মিলন গোম্বুর ওপরে। এইখানে পোস্টিং হয়ে আসার আগেই শুনেছে মিলনজী একজন অসাধারণ অফিসার। দুর্ধর্ষ ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক অথচ একটার পর একটা ঘটনা ওঁর চোখের সামনে দিয়েই ঘটে গেল। সৌরভ সবকিছুই শেয়ার করেছে ওঁর সঙ্গে তবু মিলনজী কিছুই করতে পারেন নি। সবচাইতে বড় কথা 'গ্লোবাল কেমিক্যালস-এ ঘটনার রাতে মিলনজীর ফোন ভোর থেকে সকাল অবধি বন্ধ ছিল। বহুবার চেষ্টা করেও পায় নি সৌরভ। সেদিন সকালে উনি পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলেন। নিজের গাড়িতে যাতে পুলিশের আর টি সেটে ধরা না যায়। অথচ এমন সিনসিয়ার অফিসার এতবড় একটা ঘটনার পরের সকালেই চার ঘণ্টা স্রেফ উবে গিয়েছিলেন! এটা অসম্ভব। তারপর থেকেই মিলনজীকে খুব গোপনে শ্যাডো করতে থাকে থাকে সৌরভ। সৌরভ জানে ওঁর মত দক্ষ অফিসার ইলেকট্রনিক ট্রেইল রাখবে না। তবে কখনও কখনও কিছু না থাকাটাই বড় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সোহিনির সঙ্গে সার্কিট হাউসে সকালবেলায় কী কারণে দেখা করতে গিয়েছিলেন মিলন? সঙ্গে একটা প্যাকেটও ছিল। সোহিনী যেদিন

বাগডোগরা থেকে গুয়াহাটি ফিরে গেল, সেদিনের প্যাসেঞ্জার লিস্টও চেক করেছে সৌরভ। সোহিনীর পাশের সিটেই কোনও এক বিপাসনা মুখার্জি বসেছিলেন।

বিপাসনাকে ট্রেস করা যায় নি। তবে বিপাসনা ওই দিন দোভাষী হিসেবে 'গ্লোবাল কেমিক্যালস-এ ছিল সারাদিন। এবং ওইদিন রাতেই বিস্ফোরণ। তারপরের কয়েকটা দিন বিপাসনার ফুট প্রিন্ট পায় নি সৌরভ। অথচ ফেরার সময় সোহিনী এবং বিপাসনা পাশাপাশি সিটে। সোহিনীর সঙ্গে মিলন গোস্বুর দেওয়া প্যাকেট। এটুকুর ভিত্তিতেই রাধারানিকে চার্জ করেছিল সৌরভ। এবং ঢিল ঠিক জায়গায় লেগেছে। তবে কি সোহিনীও প্ল্যান্টেড? কিন্তু তা হবে কী করে! ট্রেনিং-এর সময় থেকেই তো সোহিনী রাঠোর সৌরভের জন্য অনেকটা ব্যথা পুষে রেখেছে।

এক একটা সময় ভাবনার কোনও খেই থাকে না।

অগোছালো চিন্তার ভেতর থেকে উঠে আসে বিক্ষিপ্ত কিছু শব্দ। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স থেকে অনেক মেসেজ ওকে রিসিভ করতে হয়। রেগুলার মেসেজ এবং কিছু অ্যালার্ট। সবটা যে সবসময় মিলে যায় তাও নয় তবে নিজেকে ঠিক সময়ে অ্যাকটিভেট করার জন্য প্রতিটা মেসেজকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখা সৌরভের অভ্যাস। 'সামথিং অরেঞ্জ ইজ লাইকলি টু হ্যাপেন', তেমনই একটা বার্তা ছিল। এবং মিলেও গিয়েছিল। অনেকসময়ই এই ধরনের ইনটেল-এ কিছু রেড হেরিং শব্দবন্ধ থাকে। সেগুলো আইবি থেকেই ডিকোড করে পাঠায়। তবে সবটা কখনই সম্ভব হয় না। এই ভরা বর্ষার দুপুরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় সৌরভ। একপাশের আকাশ কালো হয়ে এসেছে। এখুনি বৃষ্টি নামবে আবার। রুদ্রপলাশ গাছটা সবুজ হয়ে গেছে আবার এই ক'দিনের জলে। এত সবুজ, এত সবুজ চোখ জুড়িয়ে যায়। মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ ঝলকের মত দু'টো শব্দ খেলা করে সৌরভের। কয়েকমাস আগেই পড়েছিল। নানান সতর্ক বার্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুটো শব্দ সৌরভের কানে বেজে ওঠে,

'কোড গ্রিন।'

চিকা বিশুর লাল চুল। কানে দুল নেই তবে গলায় ডোবারম্যান বেঁধে রাখার মত মোটা সোনার চেন আছে। থলথলে চেহারায় স্পোর্টস গেঞ্জি সঙ্গে সরু পায়ের ওপর স্কিনি জিন্স। এত টাকা রাখার এবং খরচ করবার রাস্তা চিকার জানা নেই। তাই সবচেয়ে সহজ রাস্তাগুলো বেছে নিয়েছে। মদ, মেয়েছেলে এবং পলিটিক্স। লোকে নাকি টাকা কামাবার জন্য পলিটিক্সে আসে। চিকা বিশু খর্চা করার জন্য এসেছে। ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট হাসিল করেই ছাড়বে। এর মধ্যেই দুটো রক্তদান শিবিরের প্রধান অতিথি, শীতকাল নয় এখন তবু একটা কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি। এমন নানা অনুষ্ঠান চিকা এখন স্পনসর করে

'গ্লোবাল কেমিক্যালস-এ ঘটনার রাতে মিলনজীর ফোন ভোর থেকে সকাল অবধি বন্ধ ছিল। বহুবার চেষ্টা করেও পায় নি সৌরভ। সেদিন সকালে উনি পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলেন। নিজের গাড়িতে যাতে পুলিশের আর টি সেটে ধরা না যায়। অথচ এমন সিনসিয়ার অফিসার এতবড় একটা ঘটনার পরের সকালেই চার ঘণ্টা স্রেফ উবে গিয়েছিলেন! এটা অসম্ভব।

থাকে। সম্প্রতি একটা কবিতাপাঠের আসরে চিকাকে নেমন্তন্ন করেছে আয়োজকেরা। কবিতার সঙ্গে চিকার আসমান জমিন দূরত্ব কিন্তু এই ওয়ার্ড থিকথিক করছে কবি এবং সাহিত্যিকে। পরিবার পরিজন মিলিয়ে অন্তত সাড়ে তিনশো ভোট ওদের। বুলেট পঞ্চার ভোটের হিসাব তুখোড়। ও-ই অর্গানাইজ করেছে এই কবিতাপাঠের আসর। চিকা বিশু উদ্বোধক, একজন দর্শনের অধ্যাপক প্রধান অতিথি। চিকাকে টেনশনে দেখে বুলেট পঞ্চা অভয় দেয়,

'দাদা, টেনশন লেনেকা নেহি, এই কবিরা কেউ

কারও কথা শোনে না। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। আপনি শুধু সবাইকে ভালো বলে যাবেন।'

'আমি হকার সামলাই। মেশিন কিনি, মেশিন বেচি, বুলেট। কবিতার তো কিছুই বুঝি না', অসহায় লাগে চিকা বিশুর।

'দাদা, নীল পাঞ্জাবি ওপরে সাদা জহর কোট এতেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। পানপরাগটা ওই দু'ঘণ্টা বাদ দিতে হবে, ব্যস।'

'কেন?'

'ওটা আজকাল বাঙালি লুকিয়ে খাচ্ছে। অনেক রকম 'পক্ষ' হয়ে গেছে তো।'

'আমাকে কি কিছু বলতে হবে?'

'ওই, সব ভালো বলবেন। কবিতা ভালো, গল্প ভালো। আপনারা সবাই ভালো। ভালো শোনার পর কেউ আর কিছু মাথায় রাখে না, দাদা।'

'বলছিস?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট, চিকাদা। অ্যানাউন্সারই তো অর্ধেক কামাল করে দেবে।'

'কীভাবে?'

'সমাজসেবী, সাহিত্যপ্রেমী শ্রী বিশ্বজিৎ পাল মহাশয়... এইসব ইন্ট্রো দেবে। শুধু মুচকি হাসবেন আর কোনও মহিলা কবির দিকে নজর ফিক্স করবেন না।'

'তাও করা যাবে না?'

'না দাদা। ওসব আপনার খেলার মাঠ না। লাস্ট যেখানে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকার ওই ম্যাগাজিনটা উল্টেছেন?'

'তুই আছিস কী করতে? স্কুল ম্যাগাজিনে তুই তো কবিতা লিখতিস।'

'বুকের গভীরে পুঁতে রেখেছি পুরনো সেফটিপিন...'

'মানে', চিকা বিশুর চোখ গোল হয়ে আসে, 'ইনফেকশন হয়ে যাবে তো!'

'হ্যাঁ, দাদা। বোঝেন নি তো?'

'না।'

'তাহলে হাসি হাসি মুখে ওপর ওপর তাকাবেন। নজর ফিক্স করবেন না। দু'জন মাহির আলোচক আছেন। এ ব্যাপারটা ওঁরাই সামলে নেবেন। প্রাইজ দেবেন, মেমেন্টো দেবেন। কাজ শেষ।'

চিকা বিশু এবং বুলেট পঞ্চুর এমত কাব্যময় আলোচনার মধ্যে বাটা সুভাষের ফোন আসে। চিকা এতক্ষণে চার পেগ হাই। কিন্তু সুভাষের ফোন মানেই নেশা ছত্রখান। আজকাল 'ফেসটাইম' ছাড়া সুভাষদা ফোন করে না,

'বিশু, মুঙ্গের আর নেপালে লোক পাঠাতে হবে।'

'কেন দাদা, কাট্টা দেখেই তো লোকে হেগে ফেলছে। আবার নেপাল কেন?'

'যা বলি শোন। লং রেঞ্জ লাগবে বেশ কয়েকটা। আর এক ডজন নাইন এম এম।'

'খর্চা?'

'এন জে পি টু শেয়ালদা পুরো হকার তোকে দিয়েছি। তবু জিজ্ঞেস করছিস?'

'মানে এতটা?'

'চিন্তা করিস না। কুড়ি পেটি নিয়ে যা, বাকিটা ম্যানেজ করিস।'

'ওকে দাদা', মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করে চিকা বিশুর। এমন অর্ডার শুনলে বুকের ভেতর পুঁতে রাখা অজস্র পুরনো সেফটিপিনগুলো খচখচ করে। তবে সুভাষদার কথা মানে কথা। যে করেই হোক, কাজ করে দিতে হবে।

মিলনজীকে এত গম্ভীর আগে কখনও দেখেনি সুভাষ।

'খুচরো অপারেশন অনেক হল। হরেন কুন্ডু আন্ডারগ্রাউন্ডে, শেষ কামড় দেবে। এখন ফাইনাল অ্যাসল্টের সময়, সুভাষ।'

'কিন্তু হার্মাদ-দের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ডে লড়বে কে, মিলনজী?'

'ভেবে রেখেছি। শুধু দেখো লজিস্টিক্সে অভাব যাতে না হয়। একটা প্রাণহানিও আমরা চাই না কিন্তু খওফ কি মাহোল তৈরি করাটা জরুরি। সাধারণ মানুষ আমাদের দিকে। ভয়টা তাদের জন্য যাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি।

'এসব চালাবে কে মিলনজী?'

'ভেবো না। লোক আছে। ট্রেইন্ড লোক। রক্তপাত হবে না কিন্তু ভয়ের দোকান খুলে দিতে হবে।'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

তন্ত্র

অরণ্য মিত্র

তনুলেখা ছিল পুরনো এক আধাগ্রামীণ জনপদে বড় হয়ে ওঠা মেয়ে। বাবা প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। অল্প-বিস্তর সচ্ছলতার মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল সে। একুশ বছরে পা দিতেই সুযোগ্য পাত্র জুটে গেল তাঁর ভাগ্যে। তনুলেখা প্রেম করে নি কখনও। গ্রামের স্কুল-কলেজেই পড়াশুনো তাঁর। সুন্দরী আর ছিপছিপে শ্যামলা চেহারার তনুলেখা জীবনসঙ্গী অনুসন্ধানের কাজটা ছেড়ে দিয়েছিল অভিভাবকদের ওপর। তাঁর হেডমাস্টার বাবা প্রবীর পাল অবশ্য ভেবেছিলেন মেয়ে বিএ পাস করলে তারপর পাত্র যোগাড়ে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কারও হাতেই নেই। গোকুলগড় হাইস্কুলের টিচার আনন্দ মজুমদার ছিলেন প্রবীরবাবুর সহপাঠি। কিছুদিন আগে তিনি এসেছিলেন প্রবীরবাবুর

গ্রামে। ডুংরিঝোড়া গ্রামের হাতে বোনা মাদুর বেশ বিখ্যাত। কাউকে উপহার দেবেন বলে মাদুর কিনতে এসেছিলেন আনন্দ মজুমদার। বন্ধুকে নিজের বাড়িতে চা খাওয়াতে নিয়ে আসেন প্রবীর পাল। তনুলেখাকে একবার দেখেই আনন্দ মজুমদার ঠিক করে ফেলেন যে এই মেয়েক তিনি পুত্রবধূ করবেন এবং খুব শিগগির করবেন।

আনন্দ মজুমদারের ছেলে সুশান্তর বয়স আঠাশ-উনত্রিশ। তিন বছর হল চাকরি পেয়েছে একটা কলেজে। পড়াশুনোয় সে বরাবরই ভাল। বাপের এক ছেলে, ভাল মাইনে, নেশা নেই— এক কথায় পাত্র হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করার জন্য প্রবীর পালকে দু-বার ভাবতে হয় নি। ফলে তনুলেখার বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ করে। সুশান্ত এতদিন কলেজের কাছাকাছি একটা এক কামরার বাড়ি ভাড়া করে থাকত। এবার সে বাড়ি ভাড়া করল শান্ত একটা পাড়ায়। পাড়াটায় কোনও ফ্ল্যাট বাড়ি নেই। চওড়া রাস্তার দু-পাশে দোতলা-তিনতলা বাড়ি। অনেকগুলোই বেশ চমৎকার দেখতে। সুশান্তর কলেজ ছিল একটা আধা শহরে। যে পাড়ায় সে নতুন বাড়িটা ভাড়া নিল সেটা ছিল এক তান্ত্রিক জ্যোতিষের বাড়ি। তাঁর নাম ভবানন্দ।

ভবানন্দের সাথে সুশান্তের আলাপ এক বন্ধু মারফৎ। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সুশান্ত যখন আস্তানা বদলাবার কথা ভাবছে তখন সেই বন্ধু তাঁকে বলেছিল ভবানন্দের কথা। একতলাটা তিনি ভাড়া দেবেন। ভবানন্দ নিজেকে ‘সম্মোহনে পারদর্শী’ বলে দাবি করেন তাঁর বিজ্ঞাপনে। তবে তাঁর পসার যে বেশ ভাল সেটা তাঁর বাড়ি এবং সামনের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। ঘাড় অবধি ঢেউ খেলান চুল এবং বাদামি রঙের দীর্ঘ শরীর দেখে বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। তান্ত্রিক জ্যোতিষের বাড়ি শুনে তনুলেখা প্রথমে একটু চিন্তায় পড়েছিল। এমনিতে দেবদ্বিজে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। জ্যোতিষেও। কিন্তু ‘তান্ত্রিক’ বিশেষণটা তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সুশান্ত অবশ্য বলেছিল, ‘অমায়িক লোক। দেখলেই ভাল লাগবে।’

কথাটা সত্যি। যদিও ভবানন্দের ঝকঝকে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। কেমন অস্বস্তি হয়। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁকে বেশ ভাল লেগেছে তনুলেখার। বাড়িটাও সুন্দর। ভবানন্দ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দোতলায় থাকেন। তিনতলায় পুজোর ঘর। বাড়িতে কেউ ভাগ্যবিচারের জন্য এলে তাঁকে দোতলায় উঠতে হয়। একতলাটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন সেদিক থেকে। তনুলেখার সদ্যবিবাহিত জীবন শুরু হল বেশ আনন্দের সাথেই। হানিমুন করতে গেল পুরীতে। তনুলেখা আগে সমুদ্র দেখে নি।

সুশান্তের মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখে নি তনুলেখা। কথা একটু কম বললেও হাসিখুশি মানুষ। শরীরে অল্প মেদ জমলেও চেহারা মোটের ওপর সুঠাম। কদাচিৎ এক-আধটা সিগারেট খায়। কলেজ, ছাত্রছাত্রী, টিউশুনি— এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে। টিউশুনি সে আগে তেমন করত না। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পাড়াতেই নাকি চারকাঠার মত একটা জমি সে পছন্দ করে রেখেছে। তনুলেখা এখনও সে জমি দেখে নি। তবে সেটা কেনার জন্য বাড়তি পয়সা দরকার সেটা সে জানে।

মাস তিনেক মসৃণ গতিতে জীবন কেটে যাওয়ার পর একদিন তনুলেখা বুঝতে পারল সুশান্তের একটা সমস্যা আছে। যৌনতার ক্ষেত্রে সে শিশুর মত হুটোপাটি করে। প্রায় দিনই তনুলেখার বস্ত্র উন্মোচন থেকে শুরু করে হামলে পড়ে নিঃশেষ হতে সুশান্তের সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। নিজের প্রয়োজন মিটে গেলেই সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। গোড়ায় অবশ্য ব্যাপারটাকে কৌতূকের দৃষ্টিতে দেখত তনুলেখা। বিয়ের পর প্রাথমিক জড়তা-সঙ্কোচ কাটিয়ে তনুলেখা যখন শরীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় সুখ খুঁজে পেতে শিখছে তখন সে চাইত সুশান্ত নিশ্চয়ই অঙ্গসঞ্চালন চালিয়ে যাবে। তাঁর আশা ছিল যে সুশান্তের দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়াটা সাময়িক। বস্তুত সুশান্তেরও কোনও যৌন অভিজ্ঞতা ছিল না। তনুলেখা ভেবেছিল যে সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।

কিন্তু তার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য পর্ন ভিডিওর নায়কের মত বিচিত্র ভঙ্গিতে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করত। সেটা হত আরো

হাস্যকর। এর জন্য যে ফিটনেস দরকার সেটা তাঁর নেই। ফলে তনুলেখা বিরক্ত হত। তারপরেই আবিষ্কার করত সুশান্তের স্খলন হয়ে গেছে।

তনুলেখার তাই মনে হল যে সুশান্তের শীঘ্রপতন আসলে একটা সমস্যা। মেয়েদের জন্য প্রকাশিত একটা পত্রিকা পড়ে সে জানল পুরুষদের এই সমস্যা হয় মানসিক কারণে। এর জন্য কাউন্সিলিং দরকার। কিন্তু যে আধা শহরে তাঁরা থাকে সেখানে এই রকম কাউন্সিলর নেই। থাকলেও কেউ যেত কি না সন্দেহ। তা ছাড়া সুশান্তকে ব্যাপারটা বলেও উঠতে পারে নি তনুলেখা। তবে ভায়াগ্রা নেওয়ার কথা বলেছিল। সুশান্ত সেটা শুনে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে ভায়াগ্রা জিনিসটা শরীরের পক্ষে ভাল নয়।

তখন তনুলেখার মনে হয়েছিল যে সুশান্তের সাহস খুব একটা বেশি নয়। হয়ত কলেজের টিচার হিসেবে সে স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকে ভায়াগ্রা কেনার কথা ভাবতে পারে নি। তনুলেখা এটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু অনলাইনে তো কেনাই যেত।

ফলে সুশান্তর সাথে একটা দীর্ঘ রমণের তৃপ্তি তাঁর মনে থেকে গেল কেবল ইচ্ছে হয়ে। প্রতিটি মিলনের শুরুতে সে ভাবত সুশান্ত তাঁর সবল শরীর দিয়ে তাঁকে পিষে ফেলবে অনেকটা সময় নিয়ে। কিন্তু বিছানায় সুশান্ত আসলে ছিল কয়েক মিনিটের একটা দানব। যে সুখ একটু একটু করে তনুলেখার শরীর থেকে সে কুড়িয়ে নিতে পারত, তা সে একবারে খামচে নিতেই ভালবাসে। বহুদিনের ক্ষুধার্তের মত তনুলেখাকে সে গপগপ করে খেয়ে ফেলে। তাঁর রতিক্রিয়ায় সৌন্দর্য নেই, ভালবাসার রমণীর রক্তে তুফান তোলার মত উদ্যোগ নেই। মিলন যেন স্রেফ তাঁর নিজের জন্য। কয়েক মিনিটে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে সে যখন পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তনুলেখার শরীর জুড়ে তৃষ্ণা।

তনুলেখা অনেক দিন এ নিয়ে কাউকে কিছু বলে নি। অবশ্য এসব মুখ ফুটে দশজনকে বলার মত বিষয় নয়। তনুলেখার গ্রামের মীরাদি হঠাৎ একদিন এলেন মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে। এই শহরে তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি। এসেছেন যখন তনুলেখার সাথেও দেখা করে যেতে চান। মীরাদির সাথে তনুলেখার সম্পর্ক বন্ধুর মতই। তিনি এসেছিলেন দুপুর বেলায়। সুশান্ত কলেজে। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর এক সময় তনুলেখা বলে ফেলল কথাটা। মীরাদি শুনে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যার বাড়িতে থাকিস তাঁর পরামর্শ নিলেই তো পারিস। ছেলেদের এসব সমস্যায় তান্ত্রিকরা ভাল নিদান দিতে পারে। ভবানন্দ তো সম্মোহনে পারদর্শী! তোর বর তো সুস্থ লোক। একবার গাড়িতে উঠলে আধঘণ্টার আগে নামার কথা না। আমার বর তো এখনো ধরলে তিরিশ চল্লিশ মিনিট দাপায়! তুই ভবানন্দকেই খুলে বল ব্যাপারটা!'

মীরাদির মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল। তনুলেখা একটু হাসল কেবল। কষ্ট করেই হাসল।

'তবে এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না।' মীরাদি উপদেশের সুরে বলতে লাগলেন এবার। 'সুশান্ত ভাল ছেলে। নেশাভাঙ নেই। তোকে সুখেই রাখবে। তোকে বিছানায় পেয়ে সে সুখি হলেই যথেষ্ট। পারলে তাড়াতাড়ি একটা বাচ্চা নিয়ে নে। মেয়েদের অত শরীর-শরীর করতে নেই, বুঝলি?'

না বোঝার কিছু ছিল না। কিন্তু তনুলেখা বুঝল না। সে মেয়েদের পত্রিকায় পড়েছে যে শরীরের সুখ মেয়েদেরও প্রাপ্য। পর্যাপ্ত যৌনসুখ শরীর আর মনকে সতেজ করে তোলে। ফলে ভবানন্দেরই দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবল সে। ডাক্তার-উকিল-জ্যোতিষের কাছে কিছু লুকোতে নেই। সেদিন সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। সুশান্ত কলেজের উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে। তনুলেখা তাঁর হলুদ নাইটির ওপর একটা ওড়না চাপিয়ে গেল দোতলায়। ভবানন্দ নিঃসন্তান। সপ্তাহে কয়েকদিন তিনি বাইরে যান ভাগ্যবিচার করতে। কোথায় কবে বসবেন তা ছাপা হয় দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে। তনুলেখা দোতলায় উঠতে উঠতে ভাবছিল ভবানন্দ আছেন না বাইরে গেছেন।

ভবানন্দ ঘরেই ছিলেন। বাইরের ঘরটাই তাঁর চেম্বার। ভাল সোফায় সাজানো ঘর। এক কোণে টেবিলে ল্যাপটপ খুলে তিনি মন দিয়ে কিছু একটা করছিলেন। এ বাড়িতে ভাড়া আসার পর একদিন দোতলায় এসেছিল তনুলেখা। সেদিন অবশ্য সুশান্তও ছিল।

'আরে, কী ব্যাপার?' ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে ভবানন্দ হাসলেন। হাসিটা সত্যিই অমায়িক। ভরসা পাওয়া যায়। 'সব ভাল তো?' তনুলেখাকে মুখোমুখি চেয়ার বসার জন্য ঈঙ্গিত করে বললেন তিনি। 'সুশান্ত কি কলেজে?'

'হ্যাঁ।' তনুলেখা বসল। ভবানন্দ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন তনুলেখার মুখের দিকে। তারপর স্বাভাবিক সুরে বললেন, 'কোনও সমস্যা? আমাকে খুলে বলতে পারো।'

আমতা আমতা করে শুরু করল তনুলেখা। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু অসম্ভব পেশাদারি দক্ষতায় ভবানন্দ ঠিক বের করে নিলেন তনুলেখার মনের কথা। সব শোনার পর তিনি কিছু বললেন না। নীরবে ল্যাপটপে মন দিলেন। অসহায় স্বরে তনুলেখা বলল, 'আমি কি ভুল ভাবছি?'

'ঠিকই ভাবছ। এটা একটা সমস্যা।' ল্যাপটপ থেকে মুখে না তুলেই ভবানন্দ হালকা গলায় উত্তর দিলেন। 'মানুষের চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। দশজন সেই বৈশিষ্ট্য বিচার করে ভুল সিদ্ধান্তে আসে। কিন্তু আমরা ঠিকটা বুঝতে পারি।'

'কী বুঝেছেন?'

'সুশান্তর পক্ষে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।'

'কোনও তন্ত্রমন্ত্র?'

ভবানন্দ একটু হাসলেন। জবাব দিলেন না। তনুলেখার হঠাৎ খুব লজ্জা লাগল। এটা নিয়ে সে এত ভাবছে কেন? সুশান্তের এই ত্রুটি তাঁর কাছে এত বড় হয়ে উঠছে কেন? শরীর নিয়ে তাঁর কেন এত অতৃপ্তি? শরীরটাই কি সব?

'শরীর হল মন্দির।' তখনই বললেন ভবানন্দ। তনুলেখা একটু চমকে উঠে তাকাল ভবানন্দের দিকে। 'তোমার ব্যাপারটা হল তুমি সেই মন্দিরের দরজা খুলে ফেলেছ। এটা বন্ধ করা কঠিন। এর অবশ্য প্রতিকার আছে। তোমার দিকটা আমি ভাবব।'

তনুলেখা মাথা নিচু করে বসে থাকল। নিশ্চয়ই এমন কোনও কিছু জানেন ভবানন্দ যার সাহায্যে সুশান্তের সমস্যা দূর না করা গেলেও তাঁরটা হয়ত করা যাবে। হয়ত এমন কোনও মন্ত্র বা তাবিজ দেবেন যাতে তনুলেখার শরীরে আর কামনা না জাগে। একদিক থেকে ভাবলে সেটা হওয়াটাই ভাল।

'চা খাবে?' প্রসঙ্গ বদলের ভঙ্গিতে কথাটা বলে ভবানন্দ একটু হাসলেন। তনুলেখা জানাল যে সে কিছু খাবে না। ভবানন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। 'আমি তন্ত্রচর্চা করি। তন্ত্রের কাজ হল তনু অর্থাৎ শরীরকে ত্রাণ করা।'

'শ্মশানে গিয়ে নাকি করতে হয় এইসব?' তনুলেখা সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। 'শবসাধনাও নাকি করে তান্ত্রিকরা?'

ভবানন্দ অমায়িক হাসিটা আরেকবার হেসে বললেন, 'তন্ত্রের অনেক ধরন আছে। আমি গৃহতান্ত্রিক। আমরা সাধনা ঘরে বসেই সম্ভব। তবে সাধন সঙ্গী চাই। সঙ্গী বললে ভুল হবে, সঙ্গিনী।'

'পান নি?' তনুলেখা একটু মজা পেল। ভবানন্দ কিন্তু এবার আর হাসলেন না। পুনরায় চেয়ারে ফিরে এসে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন তনুলেখার মুখের দিকে। চেষ্টা করেও তাঁর চোখ থেকে নিজের চোখ সরাতে পারল না তনুলেখা। তাঁর মনে হল ভবানন্দ তাঁকে পড়ে ফেলছেন। এক সময় চোখ সরিয়ে ভবানন্দ শান্ত গলায় জিগ্যেস করলেন, 'তুমি পরশু দুপুরে আসতে পারবে?'

'আপনি কি কিছু দেবেন? তাবিজ-কবচ?'

'একা আসবে। দুপুর একটা বাইশে অমাবস্যা লাগবে। তার পর আসবে।' তনুলেখার জিজ্ঞাসা উপেক্ষা করে শান্ত স্বরেই বললেন ভবানন্দ। তনুলেখা সম্মতি জানিয়ে নেমে এল একতলায়।

সেদিন রাতেও বৃষ্টি পড়ছিল ঝমঝমিয়ে। তাঁকে নগ্ন করে সুশান্ত হামলে পড়তেই তনুলেখা চোখ বন্ধ করল। সে কিছু আশা করবে না। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই তনুলেখার মনে হল তাঁর শরীর জুড়ে অসহনীয় সুখের উচ্ছ্বাস জাগছে। ক্রমশ সেই উচ্ছ্বাস গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। শরীরে জেগে উঠতে লাগল একের পর এক মোচড়। বিদ্যুৎ তরঙ্গের ঝাপটা ঘন ঘন শিহরিত করতে লাগল তাঁকে। সুশান্ত তাঁকে দিচ্ছে সেই প্রার্থিত আনন্দ। অসহনীয় সুখের চরম তরঙ্গ তনুলেখাকে পাগল করে দিল। গোটা শরীর মুচড়ে সে অস্ফুটে বলতে লাগল, 'আঃ! আঃ!'

পরক্ষণেই চোখ খুলে দেখল পাশে ভোঁস ভোঁস

করে ঘুমোচ্ছে সুশান্ত। তনুলেখা নগ্ন, ঘর্মাক্ত শরীরে শুয়ে আছে তাঁর পাশে। তাঁর সমগ্র চেতনায় এক অসীম তৃপ্তির ক্লান্তি।

ঘর জুড়ে হালকা ধূপের গন্ধ। তনুলেখা কোনও ধূপকাঠি জ্বালায় নি। তাঁর এই মুহূর্তে তৃপ্তির পেছনেও সুশান্তের কোনও ভূমিকা নেই। ঘটনাটা অলৌকিক। কিন্তু তনুলেখা কিছু ভাবতে চাইছিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল ঘুরন্ত ফ্যানটার দিকে। রতিতৃপ্তির অবশেষটুকু উপভোগ করতে করতে এক সময় সে তলিয়ে গেল ঘুমে।

নির্দিষ্ট দিনে সে গেল দোতলায়। ভবানন্দ একটা সোফায় বসে গুণগুণ করছিলেন। তাঁর গলায় বেশ সুর আছে। তনুলেখাকে আসতে দেখে তিনি স্মিত হেসে বললেন, 'বোসো।'

'গত দু-দিন ধরে একটা ব্যাপার হচ্ছে।'

'তুমি খুশি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—।' তনুলেখা থমকে গেল। যা ঘটছে তা কি ভবানন্দ বিশ্বাস করবেন? ভবানন্দ অবশ্য হাসিমুখে তাকিয়ে ছিলেন তনুলেখার মুখের দিকে। 'আমি জানি না কী ভাবে হচ্ছে — কিন্তু আমার ভাল লাগছে।'

'এসো আমার সাথে।'

ভবানন্দ সোফা ছেড়ে উঠলেন। তাঁকে অনুসরণ করে তনুলেখা পৌঁছল তিনতলায়। যেটাকে সে পুজোর ঘর বলে জানত সেটায় কোনও ঠাকুর-দেবতা নেই। বড় ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝের ওপর খোদাই করা একটা বিচিত্র ছক। ভবানন্দ তনুলেখাকে বললেন সেই ছকের মধ্যে দাঁড়াতে। তনুলেখা তাই করল। তখনই তাঁর নাকে এল ধূপের চেনা গন্ধ।

'গন্ধ পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'গন্ধটা গত দু-দিন পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওই গন্ধটাই আমি। আমাকেই নিয়েছ তুমি তোমার মধ্যে।'

তনুলেখা এসেছিল আগের দিনের মতই নাইটির ওপরে ওড়না জড়িয়ে। ভবানন্দ এবার দু-হাতে ওড়নাটা তুলে নিয়ে নরম গলায় বললেন, 'সাধন সঙ্গিনী পেতে হয় না। সাধন সঙ্গিনী নিজেই আসে। সময় হলেই আসে।'

'আপনার স্ত্রী নিচে আছেন—।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল তনুলেখা। ভবানন্দ সে কথা যেন শুনলই না। ওড়নাটা নিচে ফেলে দিয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'যথার্থ সঙ্গমে সব চাইতে বেশি তৃপ্ত হয় নারী। তুমি নিরাবরণ হও।'

তনুলেখা তবুও অস্ফুটে বলল, 'আপনার স্ত্রী—।'

'সে আসবে না। আমি কারোর চোখের দিকে তাকিয়ে যা চাই সে তাই করে। তাঁকে আমি ঘুমিয়ে পড়তে বলেছি।'

তনুলেখা নিজেকে নিরাবরণ করল। তাঁর ছিপছিপে শরীরের দিকে তাকিয়ে ভবানন্দের মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র হাসি। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এসো। আমাকে নিরাবরণ কর।'

শীতল মেঝের ওপর সেই অদ্ভুদ ছকে শুয়ে তনুলেখা প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে উপভোগ করল এক দীর্ঘ, ছন্দোময় রমণপর্ব। নারী হওয়ার সুখ সত্যিই স্বর্গীয়।

কয়েক মাস কেটে গেছে। সুখেই আছে তনুলেখা। সুশান্তর হামলে পড়া প্রায় শূন্যতে এসে ঠেকেছে। যেন যৌনতা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। সে খায়, ঘুমোয়, পড়ায়। মাঝে মাঝে তনুলেখাকে নিয়ে বের হয় কেনাকাটা করতে। সুখি দম্পতির মতই দেখায় তাঁদের। তনুলেখার শরীরে যৌবন ফেটে পড়তে শুরু করেছে ইদানীং। সে এখন নিশ্চিত যে সুশান্ত তাঁর স্বামী ঠিকই কিন্তু সে আসলে ভবানন্দের সাধন সঙ্গিনী। সম্মোহিতের মতই সে নিয়ম করে দুপুর বেলায় তিনতলায় যায়। সেখানে ভবানন্দ তাঁকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। ধূপ জ্বালিয়ে দেন। আরো একটি দীর্ঘ রমণের প্রতীক্ষায় থর থর করে কাঁপতে থাকে তনুলেখা।

তনুলেখার শরীর জুড়ে বন্যা। রক্ত জুড়ে আগুন। ভবানন্দের তিন তলায় প্রতিটি দীর্ঘ রমণে তাঁর আগুন নেভে। তাঁর তনু সাময়িক পরিত্রাণ পায়।

গল্প

আমার এ পথ...

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী

যাব্বাবা! উর্বশীও হাওয়া! একটু আগেই দেখেছে বিহান, আনন্দলোকও বেপাত্তা। বর্ধমান রোডের পাশে তাদের প্রথম যৌবনের সখ্যতা ছিল ঝংকারের সঙ্গে। সে জায়গা তো ছয়লাপ ঝাঁ-চকচকে দোকানপাটে। আর গতকালই কৌতূহল বশে মেঘদূতকে আবিষ্কার করেছে ঢাকা পড়ে যাওয়া বিপণিগুলোর মাঝে। সে কেবল অস্তিত্ব এখন, বিগতযৌবনা। বিহান ভাবছিল, তার কৈশোরের, যৌবনের কথা। এ শহর তো সে চেনে না! এত জমজমাট, ভিড়ভাট্টায় পরিপূর্ণ শহরটা তার কাছে অচেনা। প্রায় ত্রিশ বছর বাদে এখানে আসা। একরাশ আদি-অকৃত্রিম ভালবাসার মিশেলে সে যখন হপ্তাখানেক আগে নেমেছিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে, দার্জিলিং মেল থেকে তখন কাতারে কাতারে টুরিস্ট নামছিল। সেই বিশাল ফুট-ব্রিজটা পেরোতে পেরোতে যখন সকাল ন'টার মেঘমুক্ত আকাশে দূরে পাহাড়ের গায়ে স্বমহিম কাঞ্চনজঙ্ঘার আবির্ভাব দেখতে দেখতে টুরিস্টরা অবিরাম ছবি তুলছিল মুঠোফোনে, সে তখন অনুচ্চারিত কণ্ঠে বিড়বিড় করেছিল, হুঁ হুঁ বাবা, এমন শহর তুমি কোত্থাও খুঁজে পাবে না, যেখানে হিলকার্ট রোড থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান হয়!

তো, গত তিনদিন ধরে বিহান, দুপুরে চাট্টি খেয়ে বেরিয়ে পড়ছিল একটা টোটোর সঙ্গে অলিখিত চুক্তি করে। সুজয়, টোটোচালক ছেলেটির সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গেল তার। আর সুজয় যখন জানতে পারল আরোহী দাদাটি স্মৃতিকাতরতায় ভরা বছর ত্রিশ আগেকার শহরের রাস্তাঘাট এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াবে, কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, তখন দারুণ একটা হাসি উপহার দিয়ে বলেছিল, 'প্রথম একজন আমার মনের মত সঙ্গী পেলাম দাদা। ...চলো, আমিও তোমার সঙ্গে স্মৃতির-শহরে ঘুরে বেড়াই। ...তুমি বললাম কিন্তু... তবে, গ্যারান্টি দিতে পারছি না, তোমার প্রাক্তনী ঠিক আগের মতো আছে কি না!'

বিহানের বেশ লাগল সুজয়কে। বিশেষত, ওর শব্দচয়ন এবং তার ব্যবহারকে। তো, তিন দিন ধরে ও শহরটা চষে বেড়াচ্ছে। মাসীর বাড়ি তার এখানে। 'কী যে পাগলামো শুরু করেছিস বুঝি না বাপু...'। মাসীর কথায় বিহান হেসেছিল। ঠিক যেরকম একটা দুঃখমিশ্রিত হাসি ওর অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে, কৈশোর-যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। 'দাঁড়া, একদিন সবাইকে ডাকছি। জম্পেশ আড্ডা হবে।' আশ্বাস দিয়েছে প্রবাল, সুমন্তরা। ব্যস্ ওই পর্যন্তই। তারপর আর দেখা নেই বাবুদের।

'দাদা, তোমার উর্বশী, আনন্দলোক, ঝংকার তো এখন ইতিহাস। ...চল, উত্তরায়ণে যাই। আইনক্স পাবে। ফুড কোর্ট আছে। ব্র্যান্ডেড পোশাকের দোকানও পাবে। ...আর শীতের রোদ গায়ে মেখে বসে থাকা সুন্দরীদেরও...' ফিচেল হেসে বলে সুজয়।

'মার খাবি? আমি তোর দাদা না?'

'বন্ধু কাম দাদা....।' সপ্রতিভ জবাব সুজয়ের।

'না রে, ইতিহাসটা মনে পড়ে যায়। ওখানে একটা চা-বাগান ছিল। মনে আছে, শিবরাত্রির মেলা বসত... কত এসেছি... সভ্যতা কীরকমভাবে ইতিহাসকে ঢেকে দ্যায়, তাই না রে?'

'হ্যাঁ জানি। শুনেছি।'

আনমনা বিহানকে চাঙ্গা করতেই বোধহয় সুজয় বলে, 'চল, একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাই।'

শক্তিগড় চিনতে পারছিল। কিন্তু, এত ফ্ল্যাট,

ঘনবসতি ছিল না তখন। একটা বিশাল মাঠ, সুন্দরভাবে ঘেরা দেওয়া। আজ রবিবার। ছুটির হবু-অপরাহ্নে তখন চারিদিকে কেমন ঝিমোনো ভাব। একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে বিহান বলে, 'কোথায় নিয়ে যাবি বললি?'

'হ্যাঁ, চা-টা শেষ করবে তো আগে!'

দু একটা বাঁক দিয়ে সুজয় তাকে নিয়ে এল যেখানে, বিহান চিনতে পারল সেই প্রাচীন গ্রন্থাগারটিকে। তার পাশেই একটা ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহ। 'রবীন্দ্র মঞ্চ'।

'দাঁড়া তো... এটা কবে হল?'

'শিলিগুড়ির অনেকেই চেনে না এখনও। জানেও না। ...দ্যাখো, পাড়ার মাঝখানে কেমন একটা বাচ্চা-সিনেমা হল!'

'হা হা হা... বেশ বলেছিস তো! বাচ্চা সিনেমা হল...'

বিহান নামল। তখন বিকেলের শো শুরু হবে সম্ভবত। গুটিগুটি পায়ে অনেক পুরুষ-মহিলা আসছেন। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত একটা বাংলা ছবি চলছে। বিহান ছবিটা দেখেছে নন্দনে। সে খুব খুশি হল এই কনসেপ্টটার ভাবনায়। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল কতকথা, ছোটবেলায় তারা রেল কলোনিতে থাকত। ছুটির দুপুরে মা, পাশের কোয়ার্টারের কাকিমারা মিলে রিক্সায় চেপে সিনেমা দেখতে আসতেন নিউ সিনেমা, মেঘদুত প্রেক্ষাগৃহে। সেইসব ভাবনায় জারিত হতে হতে বিহান ভাবছিল, কনসেপ্টটা কুর্নিশ জানাবার মত। শহর কলকাতায় তো বিখ্যাত ঐতিহ্যশালী সিঙ্গল স্ক্রিনের হলগুলো সব মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেসব জায়গায় এখন ঝাঁ-চকচকে শপিং মল। শিলিগুড়িতেও সে ইতিহাসকে খুঁজে পায় নি সে। এরকম ছোট ছোট প্রেক্ষাগৃহ হলে হয়ত আগেকার মত সিনেমা হলের সুদিন ফিরলেও ফিরতে পারে ভাবে সে।

'দাদা কি সিনেমা দেখবে নাকি?'

'ধুর পাগলা... চল্... দেখছিলাম 'রবীন্দ্র মঞ্চ'... আর আইডিয়াটা মুগ্ধ করছিল...'

সন্ধে নামছিল তখন। এখনও বেশ শীত এদিকে।

'এবার ফিরবে তো?'

'কেন তোকে বাড়ি টানছে বুঝি?... বিয়ে করেছিস?'

'তুমিও পারো দাদা।... বিয়ে?... দুটো যমজ বোন। হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। অসুস্থ বাবা।... আমাদের মতো বাড়িতে যা হয় আর কী!... ওসব ভাবনা ভাবাই এখন পাগলামো...'

'প্রেম করিস?... করিস নিশ্চয়। তোর মতো হৃত্বিক রোশন মার্কা চেহারা দেখলে মেয়েরা ফিদা হবেই...'

চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখল সুজয়। তারপর সেই বিখ্যাত ফিচেল হাসিটা হেসে বলল, 'আজ তো মাল খাওনি। তাও...'

হ্যাঁ, গতকাল প্রচণ্ড শীত লাগছিল। সুজয়কে বলাতে ও যে বারটায় নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কতদিন আগে শেষ এসেছিল, মনে করার চেষ্টা করছিল বিহান। সে দু পেগ নিয়েছিল। সুজয় একটা কোল্ড ড্রিংকস।

যখন জানাজানি হয়েছিল তাদের প্রেমকথা, শ্রীতমার বাড়িতে সে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া! নিচু জাতের একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে তাদের মেয়ে? মাসখানেকের মধ্যে জোর করে দেওয়া হল তার বিয়ে।

'বিয়ে করলে না কেন দাদা?' সুজয় জানতে চেয়েছিল।

'এমনি।'

'হুঁ...। বুঝলাম...। কেস ছিল নাকি?'

'একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ভাই?'

'তাই?... তাহলে কাল থেকে আর আমার টোটোয় উঠো না...'

'শালা...বাবুর রাগ হল নাকি?'

এই তিনদিনে বন্ধুদের দ্যাখা নেই। সব্বাই ব্যস্ত। ভাগ্যিস সুজয় ছিল। ছেলেটা নিয়ম করে তাকে প্রধান নগরে, মাসীর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। তার পাগলামোর সঙ্গে পাল্লা দিতে ইতস্তত করে না।

আরও খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল তারা। নাহ্, শিলিগুড়ি শহরটা সত্যিই দ্বিতীয় কলকাতা হতে পারে।

বিহান ভাবে।

রাত ন'টা বাজছে। জব্বর শীত আজ। যদিও শহরটা এখনই কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। চা খেতে ইচ্ছে করছিল তার। সুজয় চেষ্টাও করল। না। হতাশই হতে হল। শ্যামবাজার পাঁচ-মাথার মোড়ে তাদের ঠেকটার কথা মনে পড়ল বিহানের। সেখানে তো এখন সবে সন্ধে! বন্ধুদের নরক-গুলজার শুরু হয়েছে। তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছে।

ভেনাস মোড় থেকে বিধান রোডে ঢুকতে বলল সুজয়কে। তার স্মৃতি যদি প্রতাড়িত না করে, রাস্তার ও ফুটে নার্সারির দোকানগুলো থাকার কথা। আছে কি এখনও? হ্যাঁ, ওই তো! অজস্র চারা গাছ। গাছ বিশেষজ্ঞ নয় বিহান। কিন্তু, সদ্য ফোটা একটা ডালিয়া গাছ তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করল। দর দাম না করে ওটাকেই তুলে নিল টোটোয়।

'আশ্রমপাড়ায় যাব।'

'এত রাতে?'

'তুই যা চাইবি, পাবি তো! চিন্তা করছিস কেন?'

টোটো থামিয়ে দিল সুজয়। 'আমি তোমায় অন্য একটা টোটো ঠিক করে দিচ্ছি।'

মুখ নামিয়ে কথা বলছিল সুজয়।

'কী হল রে?'

'কিছু না।'

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারে বিহান, হো হো করে হেসে উঠল। 'ওফফফ! সরি ভাই। আমি কিছু না ভেবে বলেছি। আর তুই সিরিয়াসলি নিলি? বোকা ছেলে...চল্ তাড়াতাড়ি...'

'এই ক'দিনে তোমাকে এত ভাল লেগেছে দাদা...তাই কথাটা লাগল খুব...'

হালকা একটা খিস্তি দিল বিহান। তারপর বলল, 'তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। ভাবলি কী করে এত সহজে সম্পর্কটা শেষ হয়ে যাবে? তুই ভাঙতে পারিস...আমি পারব না...'

'দ্যাখা যাবে...'

'দেখিস...'

পাকুড়তলা ছাড়িয়ে তিনটে গলি পার হলেই তো... হ্যাঁ... তার নির্দেশ মত সুজয় যে একতলা বাড়িটার কাছে টোটো থামাল, সেরকমই তো আছে বাড়িটা... আশপাশে বড় বড় অট্টালিকাগুলোর আড়ালে নিজস্ব চরিত্রে আগেকার স্মৃতিচিহ্নর মত... কত দিন আগে এখানে আসত বিহান? ক'দিন এসেছিল?... সব গুলিয়ে যাচ্ছিল তার...

'এখানে রাখ্...আমি নামছি...'

কম আলোর একটা বাল্ব জ্বলছিল বারান্দায়। ভেতর থেকে কম ভলিউমে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ভেসে আসছিল... 'দূরে কোথায় দূরে দূরে...'। প্রতিটা পাড়ারই তো একটা নিজস্ব শব্দ থাকে। চরিত্র থাকে। দিনের বেলায় যা প্রতিভাত হয় সম্পূর্ণভাবে। এখানে এখন শুধু টুকটাক কিছু কথার আওয়াজ ভেসে আসছে আশপাশের বাড়ি থেকে, প্রতিবেশ থেকে...

ডোর বেলটা বাজাতেই বছর পনেরো ষোলর একটা ছেলে দরজা খুলে অবাক প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

'শ্রীতমা বসু...'

'আমি...' ছেলেটির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে যিনি তাকে দেখে চমকালেও কিছু প্রকাশ করল না বিহান। সে জানত। কিন্তু বৈধব্য বেশে শ্রীতমার বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করল নিমেষে। শ্রীতমা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'কেমন আছিস?' যেন গতকালই দেখা হয়েছে তাদের। অথচ, মধ্যিখানে কতদিনের ব্যবধান। কতদিনের? ...ঠিক কতদিনের? ভাববার চেষ্টা করছিল বিহান।

'তুই কিন্তু একই রকম আছিস বিহু...'

চমকে ওঠে বিহান। এ নামে তাকে ডাকত একজনই। আড়ালে। শালকুঞ্জে। বিদ্যাসাগর ভবন, ক্যান্টিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচকানাচে স্মৃতি-মাখানো পথে। গত কাল বিকেলে সে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছিল। এখনকার যৌবনের জয়গানে মত্ত আবহাওয়ায় কেমন বেমানান লাগছিল নিজেকে। থাকতে পারে নি বেশিটা সময়। পালিয়ে এসেছিল দ্রুত।

'দাদা, এটা...' সুজয় মনে করে দিয়ে গেল ফুলের টবটা। অথচ, বিহান তো কিছু বলে নি ওকে!

ফুল সমেত ডালিয়া গাছটা শ্রীতমার ছেলের হাতে দিল বিহান। 'কী নাম তোমার?'

'বিহান।...বিহান বসু।'

ভেতরে কে যেন ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি দিল। যখন জানাজানি হয়েছিল তাদের প্রেমকথা, শ্রীতমার বাড়িতে সে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া! নিচু জাতের একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে তাদের মেয়ে? মাসখানেকের মধ্যে জোর করে দেওয়া হল তার বিয়ে। একরোখা শ্রীতমা বন্ধুদের কাউকে নেমন্তন্ন করে নি বিয়েতে। শুধু বছর কয়েক আগে জানিয়েছিল তাকে, বেহেড মাতাল হয়ে বাইক চালাচ্ছিল তার স্বামী শ্রীমন্ত। সেবকের কাছে দুর্ঘটনায় নাকি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল বাইক সমেত তার দেহ। বন্ধুদের সঙ্গে বাইক-অভিযানে গিয়ে আর ফেরে নি শ্রীমন্ত।

'বিহানই রাখলাম নাম ওর...'

কীরকম একটা গলা ভেসে আসে শ্রীতমার কণ্ঠজাত হয়ে... অভিমান? প্রতিবাদ? নাকি আত্মপ্রত্যয়?

'কফি করি?

'না রে। চলি...'

'আয়...'

প্রতিক্রিয়াহীন শ্রুত হয় দুজনের কণ্ঠ।

'চল্...' টোটোতে উঠে বলে বিহান, 'মালের দোকান খোলা পাওয়া যাবে রে?'

'পাবে... দাও টাকা... কী খাবে বল?'

'তুই থাকবি আজ আমার সঙ্গে?'

এক মুহূর্ত কী ভাবে সুজয়। তারপর বাড়িতে ফোন করে বলে দেয়।

হিলকার্ট রোড ধরে ছুটছিল টোটো। দূরে পাহাড়ের কোলে তিনধরিয়ার আলোগুলো জ্বলছিল। মোবাইল ফোনটা বাজছিল। স্ক্রিনে শ্রীতমার নাম ফুটে ওঠে।

ঠান্ডা হাওয়ায় কেটে কেটে যাচ্ছিল কথাগুলো। 'কদিন থাকবি? কিছুই তো বলা হল না কথা... কাল দুপুরে আয়... আমার এখানে খাবি...'

'না রে কাল ফিরে যাব'।

সুজয় একবার বোধহয় পেছন ফিরে তার দিকে তাকিয়েছিল। আলোয় ভরা শিলিগুড়ির পথ তখন নিঝুম-নির্জন। শুধু কিছু যানবাহন। আর কিছু ঠিকানাহীন মানুষজন।

ল্যাব ডিটেকটিভ

সাহিত্যে ডিটেকটিভদের রহস্যভেদ পড়তে ভালো লাগে। বাস্তবে অপরাধী খুঁজে বের করতে পুলিশকে পরিশ্রম করতে হয়। তদন্তে নামার পর অনেক সময় ক্লু হারিয়ে যায়। সেই ক্লু খুঁজে বের করেন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এমন কিছু কেস এখানে তুলে দেওয়া হল, যেগুলির অপরাধী ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতেই ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও থাকছে একাধিক ইন্টারেস্টিং কেস। আগামী এপ্রিল ২০২১ সংখ্যা থেকে শুরু হবে এই ধারাবাহিক। লিখছেন **নিখিলেশ রায়চৌধুরী**।

সেই আজব মনের মানুষগুলি

তনুশ্রী পাল

ঝমঝমিয়ে রেলগাড়ি যেত বাড়ির সামনে দিয়ে। স্টেশনটিও কাছেই। মাটি কাঁপিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে, স্টেশনে একটুক্ষণ থেমে আবার হুইসেল বাজিয়ে ছুটে যাওয়া রেলগাড়ির একটা বিশেষ ভূমিকা আমাদের জীবনে ছিলই। অতবড় গাড়িটা দূর দিগন্তে বিন্দুর মত মিলিয়ে যাওয়ার পর চারধার কেমন ঝিমিয়ে যেত! রেলগাড়ি, স্টেশন, বেঞ্চ, ঝাঁকড়া লিচু গাছগুলো, গুদাম, বিভিন্ন স্টাফেদের কোয়ার্টার সর্বত্রই মর্জিমাফিক ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা আমাদের সে গ্রামদেশে ছিলই।

ইটে গাঁথা রেলের স্টাফেদের কোয়ার্টারের পাশেই শানবাঁধানো বিরাট এক ইঁদারা। সেটি অনেকেরই নিত্যপ্রয়োজনের কাজে লাগত আবার উলুধ্বনি আর ঢাকঢোল সহযোগে বিয়েবাড়ির গঙ্গানিমন্ত্রণ বা অন্যান্য পুজোয় জল ভরতে যাওয়ার প্রথাটি এখানেই সারতেন এয়োরা। কারণ নদী ছিল অনেকটা দূরে। ওই ইঁদারার অন্যধারে স্টেশন মাস্টারদের কোয়ার্টার দুটো ছিল খানিক উঁচু, সিমেন্টের বেশ পোক্ত পিলারের ওপর। তো ওই রেলকোয়ার্টারের লোহার শিক আঁটা জানালায় প্রথম দেখি সেই অন্যরকম চোখ। ঝমঝম শব্দে ট্রেন চলে যাবার পরের স্তব্ধতার মত, অপলক দৃষ্টি! উনি বড় স্টেশন মাস্টারের বউ; আধময়লা শাড়ি জড়ানো রোগাপাতলা চেহারা। কখনও সেই ইঁদারার ধারে বা স্টেশনের লিচুতলায় একা একা বসে আপনমনে কথা বলত। কালো কোট, সাদা ধবধবে শার্ট-প্যান্ট, গোলগাল স্বাস্থ্যবান গুরুগম্ভীর স্টেশন মাস্টারের এমন বউ, লোকের বিশ্বাসই হত না! ওনাদের তিন ছেলেমেয়ে সবাই হাসিখুশি, মিশুকে। ছোট ছেলে বুড়ন আমাদের বয়সী। কিন্তু তার মায়ের কারণেই তাকে আমরা এড়িয়ে

চলতাম। কে যেন রটিয়েছিল ওর মা ডাইনিবুড়ি, মন্ত্র জানে! ওরকম তাকিয়ে থেকেই বাচ্চাদের ভ্যানিস করে দেয়!

হায়! এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে এই লেখাটি লিখতে গিয়ে কত মানুষের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। কত নিরীহ মানুষকেই অকারণে ভয় পেয়েছি, বিরক্ত করেছি। কত উত্তরহীন প্রশ্ন এখন মনের ভাঁজে। ৬৮-র বন্যায় সে স্টেশন, রেললাইন সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্টাফেরাও অন্য কোথাও বদলি হয়েছিল সেসব মনে নেই। শুধু নিষ্পলক চেয়ে থাকাটুকু মনে আছে। আর মনে আছে ধবধবে শাড়ি পরা, হাসিখুশি গঙ্গাপিসির কথা; যিনি বুড়নদের বাড়িঘরের সব দায় একাহাতে সামলাতেন! ওর মাকেও লিচুতলা থেকে ধরে বেঁধে এনে স্নান করাতেন, খাওয়াতেন।

***

দু'চারমাস পরে পরেই লাটাগুড়ি না দোমহনি থেকে ট্রেনে চেপে আসত বলাইদাদা। সম্পর্কে সে আমাদের কেমন জ্ঞাতি। মুখখানা হাসিহাসি। বছর তিরিশেক বয়স হবে। ছোটোখাটো ফর্সা চেহারার মানুষটি পরনে থাকত খুব বেশি করে নীলে চোবানো পুরনো পাজামা আর হালকা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। হাতে গলায় অনেকগুলো মাদুলি তাবিজ, লাল বা কালো সুতোয় বাঁধা। চোখের দৃষ্টি চড়ুইপাখির মত সদাই চঞ্চল। সে এলেই আমাদের পাড়ার এবাড়ি সেবাড়ি দু'চারদিন থেকে খেয়ে হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলেই বিদায় নিত। এসেই বলত 'আমার বিয়া ঠিক হইচে, তোমাদের নেমন্তন্ন করতে আসলাম' অথবা 'আমাদের বাড়িতে অষ্টপ্রহর কীর্তন, তোমাদের গ্রামসুদ্ধ সবাইকে যাইতেই হবে।' সে বাচ্চাদের সঙ্গে মার্বেল খেলত। সন্ধে বা সকালে আমরা পড়তে বসলে সেও খবরের কাগজের পাতা খুলে বানান করে করে পড়তে শুরু করত। মাঝে মধ্যেই সে বেসুরো গলায় গাইতে গাইতে অন্ধকার রাতেও রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। ঠাকুমা বলতেন, 'আহা গো, মাতৃদোষে ছন্ন দশা। তার মায়েরও এই মাথার দোষ আছিল। পোলারও হেই দশা।' তাবিজ কবচে, মানতে তাকে সুস্থ করার একটা প্রচেষ্টা তার মায়ের হয়ত ছিল, কিন্তু ডাক্তার দেখানো হয়েছিল কি না জানি না। কবে থেকে যেন তার আসা বন্ধ হল। অনেকদিন পরে শুনেছিলাম, তার মা মারা যাবার পর, এক ঝড়বৃষ্টির রাতে বলাইদাদা কোথায় চলে গেছে! আর না কি তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি!

আমার বাবা ছিলেন ভারি মিশুকে প্রাণখোলা আলাপী মানুষ। তাঁর পরিচয়ের সূত্রধরে কত মানুষ যে বাড়িতে এসেছে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। এইরকম একদিন মাথায় টিকি, ফর্সা টুকটুকে রোগাপাতলা চেহারার এক বছর কুড়ির এক যুবক 'বাবুজি ঘর মে হ্যায়? বাবুজিকো বুলাইয়ে না।' ডাকাডাকি করতে করতে হাজির। তার কণ্ঠস্বরটিও তার চেহারার মতই হাল্কা পাতলা। দাদু জিজ্ঞেস করেন, 'তুমারা নাম কিয়া হ্যায়? কোতা থিকে আইলা?' 'ম্যায় তো রামশরণ তিওয়ারি হু। রেলকোয়ার্টার সে আয়া। বাবুজি মুঝে পহেচানতে হ্যায়। বাবুজি কাহা হ্যায়?'

তা এভাবে তার আসা যাওয়া শুরু। সে হালকা কণ্ঠস্বরে তার চম্পারণ জেলার গ্রামের গল্প শোনায়। চাষবাস খেতিবাড়ির গল্প। বাড়িতে সৎমা, বাবা আর ভাইবোনেদের গল্প। ভাইবোনেরা লিখাপড়া শিখলেও সে খুব বেশি লিখাপড়া জানে না। সে বড় ভাই কি না তাই কাজকাম শিখেছে। মোষ চড়ানো, খেতির কাজ এইসব। দেশোয়ালি কাকার সঙ্গে বাঙ্গালে এসেছে। বাঙ্গালে হাওয়ামে পয়সা উড়ে। তার সৎমা কামধান্দার খোঁজে এই দেশে ভেজে দিয়েছে। বহেন সবকো সাদি দেনা পড়েগা, পয়সা চাইয়ে; পয়সা কামানেকে লিয়ে বাঙ্গাল মে আয়া। এখন দেশোয়ালি কাকার সঙ্গেই থাকে; রান্নাবান্নাসহ ঘরের সব কাজ করে। আর আপাতত দু'টাইম ট্রিনে চেপে বাদামভাজা ফেরি করে; ইদিকে চ্যাংরাবান্ধা আর ওদিকে দোমহনি পর্যন্ত। কাকা এদিক সেদিক গেলে সেই ট্রেনের আগমন নির্গমণের ঘণ্টা বাজায়। স্টেশনে, কাকার জন্যে নির্ধারিত কাজগুলো সারে। স্টেশনের কাজ ফুরোলে ঘরে ফিরে ডাল রুটি বানায়। তারপর স্নানটান সেরে প্রায়ই সন্ধেবেলায় আমাদের বাড়ি এসে হাজির হয়। আমার বাবাকে দেখলেই তার মুখে হাসি ফুটত। সে বারান্দার বেঞ্চে বসে গল্প শুরু করে। বাবা রান্নাঘরে খবর পাঠাতেন, 'রামশরণরে এক গেলাস দুধ দাও দেহি।'

সে লজ্জা পেত আর হাসিহাসি মুখে দুধটুকু খেয়ে নিত। আমরা তাকে ঘিরে বসতাম। সে ভারি সুরেলা কণ্ঠে কোনওদিন হনুমান চালিশা, কোনওদিন হিন্দি রামায়ণ শোনাত; চোখমুখের নানা ভঙ্গী সহযোগে। তার সুরেলা কণ্ঠের পাঠ স্পষ্ট মনে আছে। ভক্তিভরে প্রণাম করে চমৎকার ছন্দে সে গাইত,

'জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর / জয় কপীস তিহুঁ লোক উজাগর/ রামদূত অতুলিত বলধামা / অঞ্জনি পুত্র পবনসুত নামা/ মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী/ কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী'

একবার হস্টেল থেকে ফিরে হঠাৎ মনে পড়ল, আরে রামশরণভাইকে তো বহুদিন দেখি না! 'রামশরণ ভাই আমাদের বাড়ি আসে না আর' জিজ্ঞেস করায় জানলাম, তার করুণ পরিণতির কথা! যা স্বপ্নেও কল্পনা করি নি! তার বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায়,

ভাবতে ভাবতেই সাধারণ করে শাড়ি পরা কৃষ্ণবর্ণা এক স্বাস্থ্যবতী মহিলা দরজায় আগলে দাঁড়ালেন! হতচকিত এবং বিভ্রান্ত আমি হতবাক হয়ে লক্ষ্য করি, ভদ্রমহিলার হাতে উদ্যত পিস্তল এবং তিনি সেটি আমার দিকে তাক করে রেখেছেন!

দেশবাড়ি থেকে তাকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছিল। জ্ঞাতিগুষ্ঠির মধ্যে জমিজিরেত নিয়ে মহা গন্ডগোল। ছোরা তলোয়ার বর্শাটর্শা নিয়ে ভয়ংকর মারামারি। রামশরণের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বর্শা বিঁধিয়ে দেয় প্রতিপক্ষ। নাঃ, 'মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী' তাকে রক্ষা করে নি। তার নিষ্পাপ সরলদুটি চোখ মনে পড়ে। দুঃখের স্মৃতি হয়ে মনের গভীরে থেকে গেছে সেই সাদাসিধে ছেলেটি। তার অসহায় ক্ষুদ্র জীবনটিও যেন এখন পাঠ করতে পারি সহজেই! স্বভাবে শান্ত ও সরল মানুষটিকেই হয়ত বড়ভাইয়ের কর্তব্য করতে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল অসম প্রাণঘাতী লড়াইয়ে! আর তার মৃত্যুতে একজন হিস্যাদারও তো কমল! জীবন সত্যি বড় জটিল! কার সঙ্গে কখন যে সে কী খেলা খেলবে বোঝা দায়।

***

এই অন্যরকম মানুষদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লোচনকাকার কথা মনে পড়ে গেল। সে ছিল আমাদের জ্ঞাতিগুষ্ঠিরই সদস্য। আমার বাল্যস্মৃতিতে তার বিদঘুটে চেহারাটি বর্তমান! গায়ে দুর্গন্ধ, বড় বড় ময়লা নখ, লাল টকটকে চোখ, জটপাকানো চুল, ছেঁড়া প্যান্ট, একটা বস্তার চাদর গায়ে। মুখে তার অকথ্য অশালীন শব্দের ফুলঝুড়ি! পেছন পেছন ঘেউঘেউ করতে করতে চলেছে গোটা তিনেক হাড় জিরজিরে কুকুর। গালাগালগুলো বোঝা গেলেও সে আরও প্রচুর অপরিচিত শব্দ দিয়ে অনর্গল কিছু বলতেই থাকত এবং তার মানে কেউ জানত বলে মনে হয় না। আমরা বড় হতে হতে লোচনকাকা গ্রামের প্রতিষ্ঠিত পাগল। তা সুনুপিসি বলত, গালিগালাজ করা পাগলদের নিয়ে সবচেয়ে বড় ভয় তারা হঠাৎ পেছন থেকে এসে মেয়েমানুষদের জাপটে ধরে! কী ভয়ানক কথা! তাকে আমরা যথেষ্ট ভয় পেতাম এবং যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতাম। যাইহোক যে কথা বলছিলাম; তার দুর্বোধ্য সংলাপের শুরুটা হত এভাবে, 'টিনা মাইচ্যে, আন্দা মাইচ্যে, কাতা মাইচ্যে, এগু মাইচ্যে, পাখেনা মাইচ্যে। মাইচ্যে মাইচ্যে মাইচ্যে এ এ এ।' তারপরেই গালাগাল শুরু। বাংলাভাষার যতেক কুশ্রী গালাগাল, গ্রামসুদ্ধ সব্বাই মনে হয় তার থেকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিখে ফেলছিলাম।

লোচনকাকার জীবন কি এমন হওয়ার ছিল? আদর করে তার নাম রাখা হয়েছিল পদ্মপলাশলোচন। দেশভাগের ডামাডোলে মাত্র সাতমাসেই সে পৃথিবীর আলো দেখে। তাকে নাকি তুলোয় করে বড় করা হচ্ছিল। চোখ নাক বেশ কাটাকাটা আর তার মায়ের মতই সুন্দর হয়ে উঠছিল শিশুটি। তার মা ছিলেন ওপার বাংলার অভিজাত ধনী পরিবারের আদরের কন্যা। দেশভাগের পর এপারে আসতে না আসতেই মাস তিনেকের পুত্রসন্তানটিকে ভাগ্যের হাতে রেখে তিনি পরপারে রওনা দিলেন এবং জীবনযন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেলেন। উদ্বাস্তুর অসহায়তা, দারিদ্র্য তাকে ভোগ করতে হল না। কিন্তু পদ্মপলাশের বা লোচনকাকার জীবন স্বাভাবিক হল না মোটে। এর তার

বাড়িতে খুঁটে খেয়েই লোচনকাকা সাবালক হয়ে যায়। লোচনকাকার দরিদ্র বাবা কোন সে অজ্ঞাত কারণে আবার বিয়ে করে এবং অনেকগুলি পুত্রকন্যার জন্ম দিয়ে যথাকালে পরলোকে যাত্রা করে। সেই অনটনের সংসারে লোচনকাকার ঠাঁই হয় নি একদিনের জন্যেও।

খিদে পেলে এপাড়ায় এসে বসে থাকত অফুরন্ত গালাগালির স্রোত সমেত। তখন কারও না কারও বাড়ি থেকে কলাপাতায় করে ভাত দেওয়া হত। খেয়েটেয়ে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে সে আবার কোথায় অদৃশ্য হত। শুনেছিলাম সে একসময় আমাদের গাঁয়ের 'মদন মোহন রাইস অ্যান্ড অয়েল মিলে' চাকরি করত। নানা কুসঙ্গে মিশে, বিবিধ নেশায় আসক্ত হয়ে একসময় মানসিক স্থিতি হারিয়ে পাগল হয়। মাঝে এক পাগলি এসে তার সঙ্গে নাকি বসবাস শুরু করে কিন্তু মানুষের তা সইবে কেন? ঢিলটিল ছুঁড়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে, সে পাগলিকে গ্রামছাড়া করে তবে লোকের শান্তি হল। পাগল বা সুস্থ যাই হও না বাবা, অনাত্মীয় নারী-পুরুষে মেশামেশি পাবলিকের মোটে সহ্য হয় না! যাইহোক এক প্রবল শীতের রাতে স্কুলের বারান্দায় লোচনকাকার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া শরীর আবিষ্কার হয়েছিল। শেষকৃত্যও যথানিয়মে আত্মীয়স্বজনেরা সাঙ্গ করলেন। এভাবেই সমাপ্তি ঘটেছিল অযত্নলালিত, লোচনকাকার অভিশপ্ত জীবনের। পাড়ার লোকে বলাবলি করে ক'দিন, 'আহা রে, ভগবান তারে আরও আগেই তো তুইলা নিতে পারত। ক্যান যে এতদিন কষ্ট দিল।'

***

আরেকজন অন্যরকম মানুষের কাহিনি শুনিয়ে আজকের মত কলম বন্ধ করব। তখন ডুয়ার্সের চা-বাগান এলাকায় এক মাধ্যমিক স্কুলে চাকরি করি। কো-এডুকেশন স্কুলটিতে ছাত্রসংখ্যা অনুসারে সেকশন ভাগ হত। বি সেকশনটি মেয়েদের জন্যে বরাদ্দ। সময়টা গ্রীষ্মঋতুর। বেশ চাঁদিফাটা গরম ক'দিন। এইট বি সেকশানে ক্লাস নিচ্ছি। সম্ভবত সেটা থার্ড পিরিয়ড। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা শোরগোল কানে এল। স্কুলের একটা আলাদা নিজস্ব শব্দ আছে। মনে হবে হাজারটা মৌমাছি যেন একসঙ্গে গুনগুন করছে। তাতে আমরা অভ্যস্তই ছিলাম কিন্তু এই শোরগোল তেমনটি নয়, যেন বেশ আতংক মিশ্রিত? ব্যাপারটা কী? আমার ক্লাসের মেয়েরাও উশখুশ করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে বা আড়চোখে বাইরের বারান্দা বা মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। বাইরে দেখি সত্যিই অনেক ছাত্রছাত্রী ছোটাছুটি করছে। মাঠে গিয়ে ভিড় করেছে। বারান্দাতেও জটলা? কী ব্যাপার? ভাবতে ভাবতেই সাধারণ করে শাড়ি পরা কৃষ্ণবর্ণা এক স্বাস্থ্যবতী মহিলা দরজায় আগলে দাঁড়ালেন! হতচকিত এবং বিভ্রান্ত আমি হতবাক হয়ে লক্ষ্য করি, ভদ্রমহিলার হাতে উদ্যত পিস্তল এবং তিনি সেটি আমার দিকে তাক করে রেখেছেন! মেয়েরা মুহূর্তে চেঁচামেচি কান্নাকাটি করে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে ফেলে। কাউকে কাউকে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখি পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে। আমি প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে থাকি। মাথা কাজ করে না! মহিলা ক্লাসের এমাথা ওমাথা তাকিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজেন। তারপর পিস্তলটি ভাল করে তাক করে জিজ্ঞেস করেন, 'এইটা কি এইট বি? এইটা হাইস্কুল? মেয়েদের ফ্যান নাই ক্যান? ক্যান মেয়েগুলাকে ফ্যান দেন নাই। খালি মাস্টারদের বসার ঘরে ফ্যান? এহ খুব মজা? হেডমাস্টারের ঘরে ফ্যান? এ? সবকয়টা মাস্টারকে আইজ গুলি কইরা মারব। হেডমাস্টার কই? হেডমাস্টার? দাঁড়া তো, মজা দেখায়ে ছাড়বো।' বলতে বলতে পিস্তল বাগিয়ে উনি আবার বারান্দা ধরে হাঁটা দিলেন! আমি ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ি।

সত্যি তখনও ক্লাসে ফ্যান লাগানো হয় নি। যাইহোক বুদ্ধিমান হেডমাস্টারমশাই সবটা সামলেছিলেন সুকৌশলে। রুমে বসিয়ে, চা খাইয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্লাস নাইনে পাঠরত তার ছেলেকে দিয়ে রিক্সা ডেকে ওনাকে বাড়ি পাঠানো হল। পরে জানলাম এইট বি সেকশনে পাঠরতা ওনার মেয়েটি স্কুলে একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তাতেই মা ক্ষুব্ধ! মেয়েটির মৃগীরুগি জানা ছিল আমাদের। কিন্তু মায়ের অন্যরকম রোগটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। ছেলে আমাদের আশ্বস্ত করে যে কালো চকচকে পিস্তলটি আসলে মেলায় কেনা, খেলনা পিস্তল! মা ওটা দিয়ে সবাইকে ভয় দেখায়, বাবাকেও!

রোবনামচা

জীবনসন্ধানীর কলমে স্মৃতি ও সত্তায়

সুমি দত্তগুপ্ত

লেখকের পরিচয় জ্ঞাপন বোধহয় সুধী পাঠক সমাজের কাছে দেওয়ার অপেক্ষা থাকে না। এই বইটি তাঁর পঞ্চম বই। আব্বাসউদ্দিন, লোকগান, লোককথা, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও তার লৌকিক জীবন নিয়ে তাঁর জ্ঞান ও গবেষণা অগাধ। দূরদর্শনের ব্যস্ততম অধিকর্তার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে, তাঁর বিবিধ শখ, পড়াশোনাকে একই সঙ্গে চালু রাখা কম কথা নয়। কিন্তু তিনি তা পেরেছেন, ডঃ তপন রায়প্রধান মানেই অভিনবত্ব, নতুন চমক, যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থেকেই যায় আমাদের মনে আর আমরা অপেক্ষায় থাকি, এই এঁকঘেয়ে, ক্লিশে জীবনটায় কখন তিনি আবার নতুন কিছু উপহার দেবেন। সত্যি বলতে কী, এই কিছু বছর আগেও উত্তরবঙ্গ আমাদের কাছে ছিল বড্ড দূরের, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, অনেকটাই অজানা। কৈশোরে অনিমেষের উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তরবঙ্গ আমাদের কাছে নতুন রূপে ধরা দিল। কিন্তু ডঃ রায়প্রধান একেবারে নতুন আঙ্গিকে তাঁর কলাম রোবনামচায় তুলে ধরলেন তিস্তাপারের বৃত্তান্ত— উত্তরবঙ্গ, তাঁর জনজাতি, তাদের যাপনচিত্র, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। তার এই কলামে তিনি যে অশ্রুত, অল্পশ্রুত শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস করেছেন তা সত্যিই এই বইটির অন্যতম সম্পদ। ইয়া, রানা, আবিরালি শব্দবন্ধের যথাযথ প্রয়োগ মনে থাকবে। শিরোনামগুলিতে কাব্যিক ছন্দ, ও গানের লাইনের যথার্থ প্রয়োগ নিবন্ধগুলোকে আরও আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

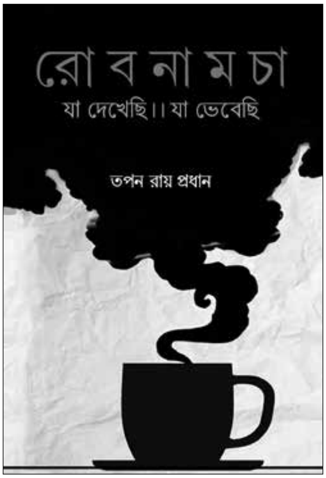

রোবনামচা। যা দেখেছি। যা ভেবেছি
তপন রায় প্রধান
এখন ডুয়ার্স। মূল্য ১৯৫ টাকা।

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে column–memoirs, আত্মজীবনীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আঞ্চলিক ইতিহাস বৃহত্তর দেশীয় ইতিহাসেরই অপরিহার্য অংশবিশেষ। নিজ নিজ অঞ্চলের ইতিহাসের প্রতি অঞ্চলের মানুষের যে স্পর্শকাতরতা, ভালবাসা, দায়বদ্ধতা থাকে, ঠিক সেই মরমী মন থেকে লেখক তার কাজ করেছেন। এখানে তাঁর লেখনী ইতিহাস ও সাহিত্যের মিশেলে হয়ে উঠেছে চমৎকার নান্দনিকতাবোধ সম্পন্ন, এবং সাধারণ্যের হৃদয়স্পর্শী। দুয়োরানি উত্তরবঙ্গের অবগুণ্ঠন সরিয়ে তার মান, অভিমান, স্বাভিমান, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রতিদিনকার রোজনামচা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন লেখক।

লেখকের বাড়ির একটা চৌকি, কত প্রাচীন তার ইতিহাস, ওই চৌকিতেই রাত্রিবাস করেছেন প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, লেখকের

আটপৌরে দাদা আটবারের ফরওয়ার্ড ব্লক দলের নির্বাচিত সাংসদ অমর রায় প্রধান ওখান থেকেই সংগঠিত ও পরিচালিত করেছেন বেরুবাড়ি আন্দোলন। লোকচক্ষুর অন্তরালের এই ইতিহাস লেখকের কলমের ছোঁয়ায় জীবন্ত।

মোক রাজা সরকার করে নাই, মোর কৃষক ভাই গেলা রাজা করিছে।

৭২তম স্বাধীনতা দিবসে রাজা দীনেশ্বর সর্দারের ধূলিয়া গ্রাম গিয়েছিলেন লেখক, যেখানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আধিয়ারদের নিয়ে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। মাথাভাঙ্গা থানার কানভাসা, জামালদহ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত কীভাবে হয়, সেই অজানা ইতিহাসেও তিনি আলোকপাত করেছেন।

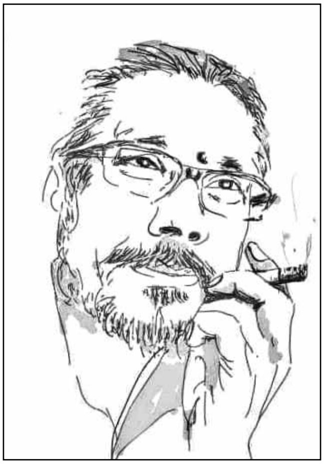

রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত মংপু— তাঁকে নিয়ে লেখকেরও অনেক আবেগ। মংপুতে রবীন্দ্র স্নেহধন্য মৈত্রেয়ীদেবীর সান্নিধ্যে কবির অনেকদিন কেটেছে, সেই সুরেলা বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত হোক, সেই আবেদন তিনি বারবার রেখেছেন।

তিস্তা জল বন্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তিনি, উত্তরের মাছের রাজা বৈরালি বা বোরোলি অস্তিত্বের সংকট কাটিয়ে উঠুক এ তাঁর আন্তরিক চাওয়া।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যান লেখক কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে রেখে যান কিছু ছবি, যার অনুষঙ্গে পাঠক মনেও চলতে থাকে নির্মাণ, বিনির্মাণ। তাই লেখক যখন উত্তরবঙ্গের মানুষের কাঁঠালপ্রীতির কথা জানান, আমার মনে পড়ে যায় রত্নগিরি অঞ্চলের মানুষের আম, কাঁঠাল নিয়ে আহ্লাদের কথা। পরিণত বয়সে সরস্বতী পুজোর দিন, ছেলেবেলার ইস্কুলে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে, মমতাময়ী বুড়ি দিদিমণির কথা, তাঁর আগলে রাখার দিনগুলোর কথা, তাঁর পড়ানোর রীতি পদ্ধতির কথা, আর আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের কথা, অনুবর্তনের নারায়ণ স্যারের কথা। এখানেই তো লেখকের সার্থকতা, তিনি পাঠকমনে ছবি এঁকে দিতে পেরেছেন।

আজকের এই উচ্চকিত, চিৎকৃত সমাজ আবহে কিছু মানুষ থাকেন, অনুচ্চারিত যাদের জীবনধারা বয়ে চলে সবার অলক্ষ্যে, এমন মানুষদের জীবনের জলছবি তিনি এঁকেছেন দূরদর্শনের প্রাক্তন ডিরেক্টর শিপ্রা রায়, লেখকের বন্ধু ভারতীদি, রমা রায়ের কথা। তাদের অনতিক্রম্য, অনন্য জীবনধারা পাঠক মনেরও সম্ভ্রম ও সমীহ আদায় করে নিয়েছে।

Community living শুধু তত্ত্বকথা নয়, এ তো এক বিশ্বাস যার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তাঁর রাজবংশী সমাজে। যখন ধান পেকে ওঠার জন্য শেয়ালের সম্মিলিত ডাক 'সাঁটিয়া পক পক' কিংবা ধান কাটার পরে শূন্য হৃদয়ে শেয়ালের ব্যথাতুর হৃদয়ের ডাক 'সাঁটিয়া ঠক ঠক'— একথা যখন তিনি শোনান মনটা মেদুর হয়ে ওঠে। কিন্তু নবান্ন উৎসবে সামিল হয়েও লেখকের মা ভোলেন না শেয়াল ঠাকুরকে নবান্নের ব্যাঞ্জন পাঠাতে, এই সমাজবোধ বোধহয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই গ্রহ যতটা আমাদের, ততটাই অন্যতর জীবেদেরও। এই জীবনবোধই তো আমাদের বাঁচতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়।

সমাজ সচেতন লেখক তিনি, ইতিহাস সচেতন তো বটেই, তাই তাঁরও আছে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্বাস। Community living এর যে ধারা তিনি জন্মসূত্রে রাজবংশী সমাজ থেকে পেয়েছেন, সেই ধারাই বোধহয় তাঁকে বিশ্বাসী করে তুলেছে commune জীবনে বিশ্বাসী এসইউসিআই দলের মতাদর্শে।

তাঁর লেখায় এসেছে কীভাবে তিনি স্কুল জীবনে শঙ্কর স্যারের কাছে দীক্ষিত হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর mentor হয়ে উঠেছেন, অধ্যাপক জয়দেব

মন্ডল, ও ভাইয়াদা। তাঁর সেইসময়ের একেবারে রাস্তায় নেমে রাজনীতি করার দিনগুলো কিন্তু খুব কঠিন সংগ্রামেরই ছিল, তবুও ছিল আত্মবিশ্বাসের, স্বপ্নের, তাঁর লেখা তারই স্বাক্ষর বহন করে।

অললই ঝললই মাদারের ফুল, কইনার কানত ঝুমকার দুল।

কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন লেখকের মনে নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। বসন্ত এসে গেছে, বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিমূল, পলাশের ছবি। চারিদিকে এখন পলাশ উৎসব। মাদার বা মান্দার সেই তুলনায় ব্রাত্য। কিন্তু বসন্তের সাথে তারও চিরকালীন সম্পর্ক। উত্তরবঙ্গে মান্দার শুধু প্রেম নয় বিরহেরও ফুল। সেই মাদার লোকসমক্ষে আসুক নিজ মহিমায়, মাদার উৎসবের মাধ্যমে, চেয়েছেন লেখক।

লেখকের স্বপ্নে ঘেরা উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী হলদিবাড়ি স্টেশন। ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং হিমালয়ের সাথে যোগাযোগের একমাত্র রেলপথ, স্বাধীনতার পরেও যার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল, তাই অনেক কল্পকথাও গড়ে উঠেছে লোকমুখে সেই হলদিবাড়িকে নিয়ে, সেই রূপকথা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন লেখক, পরম্পরায় আমরাও।

এই বইয়ে তিনি শুনিয়েছেন বন্ধুতার কথা, কৈশোরের প্রথম প্রেমের কথা, বিশ্বাসের কথা, ভাল লাগার কথা, জীবনের অনিশ্চয়তার কথা, ভাবালু, স্বপ্নময়, রঙীন জীবনের কথা, মানুষের কথা, তাঁর চরৈবেতি জীবনের কথাও।

তাই এই বই তাঁর যাত্রা। যে যাত্রাপথে তিনি খুঁজে পেয়েছেন,অসংখ্য মণিমাণিক্য। পার্বতীচরণের আত্মজ তিনি, আব্বাসউদ্দিন তাঁর মন্ত্রে, আর শিরায়, উপশিরায় দোতারার ধুন বাজিয়ে দিয়েছেন টিপা দা। তাই তিনি সেই বীণ বাজিয়েই চলেছেন কখনও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, কখনও আবেগঘন চিত্তে, কখনও আবার খুব স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে। অভিযাত্রী তিনি— দেশজ সংস্কৃতির শিকড়কে অস্বীকার না করে আন্তর্জাতিক মননের উড়ানের, তাঁর অন্বেষণ তাই চলতেই থাকবে মানুষ রতনের। আমরা হব তাঁর সহযাত্রী, এই বিশ্বাস রইল।

অতিমারীর এই সংকটপূর্ণ আবহে বইটি প্রকাশনার দুরূহ দায়িত্ব এত সুন্দরভাবে পালন করার জন্য এখন ডুয়ার্সকে ধন্যবাদ। বইটির প্রচ্ছদ বইটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখকের কাছে প্রত্যাশা আরও অনেক বেড়ে গেল।

আমাদের জনপ্রিয় দুটি বই

মূল্য ২৫০ টাকা

বিভিন্ন সময়ে লেখা পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে এই বই। লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের নানা রং, ভাললাগা, মনখারাপের নকশা।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

ফেসবুকে প্রতি রবিবার লিখতেন 'রোবনামচা' কলম। এক বছরে প্রকাশিত সিরিজ নিয়ে দুই মলাটে প্রকাশিত হল পাঠকের জন্য।

তপন রায় প্রধান

মূল্য ১৯৫ টাকা

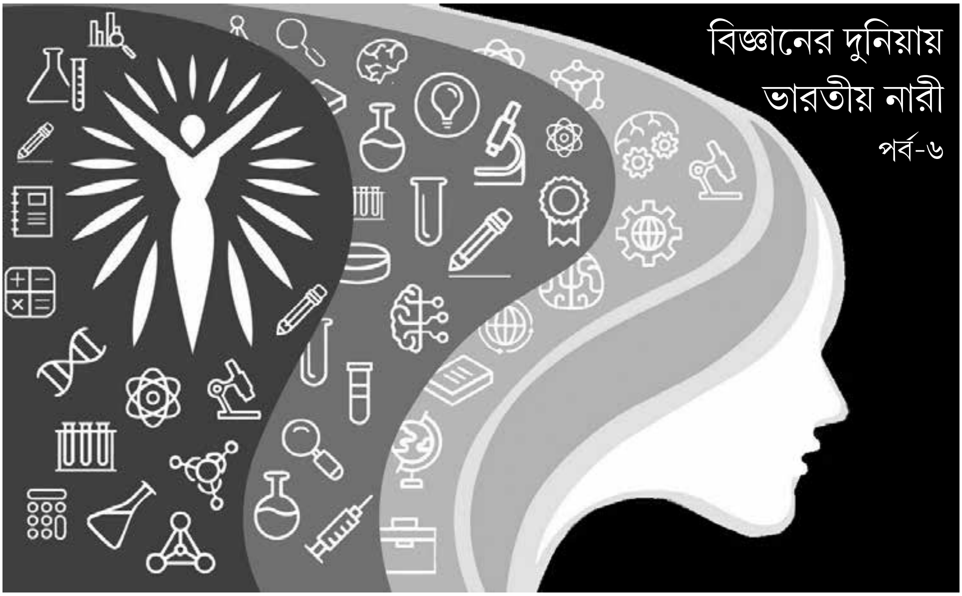

কমল রানাডিভে:

ক্যান্সার বিরোধী যুদ্ধে বিজ্ঞানের এক পথিকৃৎ সেনানী

রাখি পুরকায়স্থ

কর্কট রোগের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভবত মানব সভ্যতার দীর্ঘতম সংগ্রাম। মানব দেহে এই মারণঘাতী ব্যাধি বাসা বাঁধবার কারণটি খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতির এমত দুর্দশা ঘোচাতে বিগত বেশ কয়েকটি দশক ধরে ভারতে ক্যান্সার বিজ্ঞান বা অনকোলজি গবেষণায় নতুন গতি এসেছে। এই গতি বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে ভারতে ক্যান্সার গবেষণার গোড়ার দিককার কতিপয় বিজ্ঞানীর অপরিমেয় অবদান। সেই অবিস্মরণীয় বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানীদের মধ্যে ড. কমল রানাডিভের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে কেবলমাত্র ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রেই তিনি পথিকৃৎ ছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে ইন্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার এবং ইন্ডিয়ান উইম্যান সায়েন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের মত খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকেও দক্ষ হাতে সর্বাঙ্গীন রূপদান করেছিলেন এই বিজ্ঞান সাধিকা।

পরাধীন ভারতে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে ১৯১৭ সালের ৮ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন দিনকর দত্তাত্রেয় সমর্থ এবং শান্তাবাই দিনকর সমর্থের কন্যারত্ন কমল সমর্থ, যিনি পরবর্তীকালে কমল রানাডিভে নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেন। পিতা দিনকর দত্তাত্রেয় সমর্থ পুণের ফার্গুসন কলেজের জীববিজ্ঞানের

অধ্যাপক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশকগুলিতে মহারাষ্ট্রের খুব কম পরিবারেই কন্যা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষিত করবার কথা ভাবা হত। ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন অধ্যাপক সমর্থ। অযৌক্তিক সামাজিক নিয়মনীতি মেনে চলতে মোটেই রাজি ছিলেন না তিনি। প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল ও মুক্তমনা এই পিতাটি সব সময় চাইতেন, তাঁর পুত্র ও কন্যা সন্তানেরা সকলেই যেন সমানভাবে সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করে। নিজের সময় থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকা এমন এক আদর্শ পিতার আদর্শ কন্যা ছিলেন কমল। শিশু বয়সেই কমলের ব্যতিক্রমী মেধার পরিচয়

ড. কমল রানাডিভে

মিলেছিল। পুণের হুজুরপাগা বালিকা বিদ্যালয় থেকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন। পিতার ইচ্ছে ছিল, কন্যা ডাক্তারি পড়বেন। কমল কিন্তু মোটেই সে-পথে হাঁটলেন না। নিজের পছন্দমত বিষয় নিয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভর্তি হলেন ফার্গুসন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক স্তরে। বিশেষ বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান। ১৯৩৪ সালে তিনি ডিসটিঙ্কশন সহ বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। পিতা চেয়েছিলেন, কন্যার বিবাহ হোক ডাক্তারের সঙ্গে, কিন্তু এবারেও সেই মেয়ে নিজের পছন্দমত জীবনসঙ্গী বেছে নিলেন। ১৯৩৯ সালের ১৩ মে গাঁটছড়া বাঁধলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ জয়সিং ত্রিমবক রানাডিভের সঙ্গে। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পথে কমলের দিকে নিঃস্বার্থ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সালে পুণের কৃষি মহাবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন কমল। বিশেষ বিষয় ছিল সাইটোজেনেটিক্স।

বিবাহ পরবর্তীকালে বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) বসবাস শুরু করেন কমল। একজন সফল বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার স্বপ্ন ছোঁয়ার সোপানে তাঁর বম্বে বাস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বম্বের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ডাঃ বসন্ত রামজী খানলকরের সংস্পর্শে আসেন কমল। ভারতে প্যাথলজি ও মেডিকেল রিসার্চের জনক বলে পরিচিত ডাঃ খানলকর ছিলেন ইন্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সংস্পর্শে কমলের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী-গবেষক হিসেবে ভর্তি হন তিনি এবং ডাঃ খানলকরের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। সেই আমলের একটি উদীয়মান ক্ষেত্র ‘সাইটোলজি’ নিয়ে গবেষণা করেন কমল, এবং ১৯৪৯ সালে সাফল্যের সঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

স্বাধীন ভারতের বয়স তখন সবে দু’বছর। সে-আমলে দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রশিক্ষণ নিতে কিংবা গবেষণা করতে যাওয়া যেন প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। ড. কমল রানাডিভেকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করতে যাওয়ার জন্য ভীষণভাবে উৎসাহিত করেন ডাঃ খানলকর। ১৯৪৯ সালে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে অবস্থিত জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ডঃ রানাডিভে। সেখানে HeLa Cell Line খ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ জর্জ অটো গের অধীনে Primary and Secondary Cell Line-এর নতুন টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন তিনি।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষণা করলেও, ডঃ রানাডিভে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতে ‘ব্রেনড্রেন’ শুরু হয়েছে। গবেষণা বা প্রশিক্ষণের জন্য

যাঁরা বিদেশে যান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশে পেশাগত উত্তরণের লোভ সামলে স্বদেশে ফিরে আসতে চান না। তিনি বুঝতে পারেন, দেশের উন্নয়নের পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকারক, তাই একে প্রতিরোধ করা ভীষণ জরুরি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা তখনও আরভমাণ পর্যায়ে ছিল। ড. রানাডিভে চাইলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি ১৯৫২ সালে দেশে ফিরে এলেন। কারণ আদ্যপান্ত জাতীয়তাবাদী ড. রানাডিভে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, যে সকল বিজ্ঞানীরা পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করতে বিদেশে যান, প্রয়োজন মিটলে তাঁদের অবশ্যই স্বদেশে ফিরে এসে নিজ নিজ বিজ্ঞানক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে ভারতের সার্বিক উন্নয়নে অংশ নেওয়া উচিত। তাই ভারতীয় বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে বম্বের ইন্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের (ICRC) একজন সিনিয়র রিসার্চ অফিসার হিসেবে তিনি যোগদান করেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পরীক্ষামূলক জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। এসময় তিনি 'পরীক্ষামূলক জীববিজ্ঞান গবেষণাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি ICRC-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তার পদ সামলান। ক্যান্সার গবেষণার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সে-সময় বহু প্রতিশ্রুতিবান জীববিজ্ঞানী এবং জৈব রসায়নবিদকে নিয়োগ করেছিলেন ডঃ রানাডিভে।

একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী শিক্ষক ও দক্ষ প্রশাসক বলে পরিচিত হলেও, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন ডঃ রানাডিভে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে 'বাই' বলে সম্বোধন করতেন। গবেষণা কর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, গভীর অনুরক্তি ও একনিষ্ঠতাকে আত্মভূত করেছিলেন তাঁর গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীরা। সে-কারণে প্রায়শই মধ্যরাতে তাঁর গবেষণাগারে জোর কদমে গবেষণাকার্য পরিচালিত হতে দেখা যেত। প্রতিভাবান, সৎ ও নিষ্ঠাবান ছাত্রছাত্রীদের তিনি বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করতে উৎসাহ দিতেন। ছাত্রছাত্রী ও নবীন গবেষকদের একদিকে যেমন তিনি বিদেশে গিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করতেন, তেমনই পাশাপাশি তাঁদের প্রণোদিত করতেন বিদেশে গবেষণা বা প্রশিক্ষণ শেষে স্বদেশে ফিরে এসে ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে। সহকর্মীদের মধ্যেও একই মনোভাব জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। যখনই বিদেশ ভ্রমণ করতেন, তখনই তিনি ভারতীয় পোস্ট ডক্টরাল গবেষকদের খুঁজে বের করে, তাঁদের ভারতে ফিরে এসে গবেষণা করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতেন। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই ভারতে গবেষণা করতে ফিরে এসেছিলেন। এমন সব প্রতিশ্রুতিবান ও বরেণ্য গবেষকদের একত্র করে ইন্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারকে একটি বিখ্যাত ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলেছিলেন ড. রানাডিভে। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইন্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের অধীনে দেশের প্রথম টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন প্রতিভার চিহ্নিতকরণ ও উন্মেষে সহায়তা করবার অনন্য গুণের কারণেই কার্সিনোজেনেসিস, সেলবায়োলজি এবং ইমিউনোলজির জন্য তিনটি নতুন রিসার্চ ইউনিট তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি।

ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে ড. রানাডিভের যুগান্তকারী গবেষণা লিউকেমিয়া (রক্ত বা অস্থিমজ্জার ক্যান্সার), স্তন ক্যান্সার এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধির উৎস সম্পর্কে আশ্চর্যজনক তথ্যাবলী সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। ভারতের যে সকল পথিকৃৎ বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে প্রাণীর ওপর প্রথম পরীক্ষানিরীক্ষা করে ক্যান্সার চিকিৎসায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ রানাডিভে অন্যতম। ক্যান্সার প্রবণতা এবং হরমোন ও টিউমার ভাইরাসের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ রয়েছে, তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বম্বের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালের (পরবর্তীকালে ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার) প্যাথলজি বিভাগে গবেষণা করাকালীন তিনি 'Comparative morphology of normal mammary glands of four strains of mice varying in their susceptibility to breast cancer' শীর্ষক একটি

গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী পেশ করেন। তাঁর সেই গবেষণালব্ধ ফলাফল স্তন ক্যান্সারের সঙ্গে যুঝতে উজ্জ্বল আলোকরশ্মির মত ভবিষ্যতের ক্যান্সার গবেষণাকে পথনির্দেশ করেছে। তৎপরবর্তীকালে স্তন ক্যান্সার বিষয়ক তাঁর নিরলস গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই দেশের প্রথম বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী যিনি স্তন ক্যান্সার এবং বংশগতি, গর্ভধারণ, দেহের তন্তু বিন্যাস কাঠামো ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছিলেন— যা পরবর্তীকালে গবেষকদের বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে শিশুদের দেহে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা ক্যান্সারের উৎস সন্ধান করতে এবং ডিস্ক্রাসিয়াস নামক রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন। শিশুদের ওপর গবেষণা করে ‘Immunohematology of Tribal Blood’ শীর্ষক বিবরণীর মাধ্যমে তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল পেশ করেন তিনি। মাইকো ব্যাক্টেরিয়া মলে প্রিব্যাক্টেরিয়ার ওপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ভারতের কুষ্ঠ রোগের ভ্যাকসিনে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়। এই অগ্রণী বিজ্ঞানীর দু’শটিরও বেশি গবেষণাপত্র দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব মূল্যবান গবেষণাপত্রের বিষয়বস্তু মূলত কর্কটরোগ ও কুষ্ঠরোগ।

ডঃ রানাডিভে অন্তর থেকে অনুভব করেছিলেন, বহু সম্ভাবনাময় এবং প্রতিশ্রুতিবান নারী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানছাত্রী পরিবার এবং সন্তানপালনের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে বিজ্ঞান সাধনার আজন্ম লালিত স্বপ্নকে বিস্মৃত হতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনেরা মুক্তমনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও, আমাদের সামগ্রিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দাবি কিংবা প্রত্যাশা করে, নারীরা কেবলমাত্র তাঁদের সুনির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকাটুকুই পালন করবেন। কখনও কোনও নারী এই সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও লিঙ্গবৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষ বিজ্ঞানীদের সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিভার প্রসার ও প্রচারের পথে এ এক বিরাট বাধা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নারী বিজ্ঞানীদের একত্র করে একটি সংগঠন করতে না পারলে কোনও প্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা অসম্ভব। ভারতের সকল সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এবং তাঁদের বিজ্ঞানের আওতায় আনতে, ১৯৭২ সালে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুপ্রতিষ্ঠিত আরও ১১ জন মহিলা বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে, ইন্ডিয়ান উইমেন সায়েন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (IWSA) গঠন করতে উদ্যোগী হন তিনি। নিবন্ধিকরণের পর ১৯৭৩ সাল থেকে সংস্থাটি কার্যকর হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য— নারী বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের প্রচার, বিজ্ঞানের জগতে আসা নারীদের সমস্যাগুলিকে অনুধাবন, এবং নারীদের ক্ষমতায়নের বন্ধুর পথকে মসৃণ করে তোলা। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। বর্তমানে সারা ভারতে এগারোটি শাখা এবং দু’হাজারেরও বেশি মহিলা বিজ্ঞানী নিয়ে এই সংস্থাটি ভারতের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম। IWSA-এর অফিস ভবনগুলিতে একটি কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টার, একটি ডে কেয়ার সেন্টার ও নার্সারি, শ্রমজীবী মহিলাদের একটি হোস্টেল এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে একটি ‘সানডে সায়েন্স ল্যাবরেটরি’ থাকে। তা ছাড়া সেখানে নিয়মিত নানান বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। একদিকে যেমন পপুলার সায়েন্স লেকচার সিরিজ, বিজ্ঞান কর্মশালা, কনফারেন্স ও সেমিনার, গবেষণা প্রকল্পগুলিকে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়, অন্যদিকে তেমনই নবীন নারী বিজ্ঞানীদের জন্য ‘প্রয়োজন তথা মেধা’র ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে ‘Indian Women in Science & Their Role in National Development’ শীর্ষক অধ্যায়ে ডঃ রানাডিভে ভারতীয় সমাজে নারী বিজ্ঞানীদের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, গবেষণাগারের অভ্যন্তরে লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিবিধ

ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লিখেছিলেন, নারী বিজ্ঞানীগণ ও তাঁদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁদের পরিবার তথা গোটা সমাজের ক্রম পরিবর্তনশীল মনোভাবের কথা। সেই কতকাল আগে তিনি বিবাহিত মহিলাদের সৌকর্যার্থে উন্নত সুযোগ-সুবিধে এবং শিশু-যত্নের ব্যবস্থাদি প্রদান করবার কথা লিখেছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, এই বিষয়গুলি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও আলোচিত। গ্রামীণ পরিবারগুলিকে শিক্ষিত করে তুলবার মূল চাবিকাঠি হিসাবে মহিলাদেরই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ডঃ রানাডিভে। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বার বার জোর দিয়েছেন তিনি। নারী বিজ্ঞানীদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন অবসর গ্রহণের পরে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত হন।

তবে শুধু কথায় নয়, কাজেও ড. রানাডিভে তা করে দেখিয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণের পরে 'সত্যনিকেতন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কাজ শুরু করেন তিনি। সে-সময় মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার আদিবাসী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সঙ্গে IWSA-এর আওতাধীন সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের, বিশেষত আদিবাসী মহিলাদের, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ওষুধ, পুষ্টিকর সুষম খাদ্য সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও অনেক মহিলাকে তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

পিতা-মাতা ও জীবনসঙ্গীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন ড. রানাডিভে। সম্ভবত সে-কারণেই বিবাহিত জীবনে এবং একমাত্র সন্তান অনিল জয়সিংয়ের জন্মের পরেও তাঁর গবেষণাকার্য সামান্যতমও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখবার জন্যে ১৯৬৪ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে তাঁকে প্রথম সিলভার জুবিলি রিসার্চ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সে-বছরই তিনি মাইক্রো বায়োলজিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যশালী জি.জে. ওয়াটুমুল ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে ড. রানাডিভে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ অবদানের জন্য পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের মর্যাদাপূর্ণ 'ইমেরিটাস মেডিকেল সায়েন্টিস্ট' পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি।

দীর্ঘ কর্মবহুল জীবন শেষে ২০০১ সালের ১০ এপ্রিল এই অসামান্য বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে দেশবাসীর জন্য রেখে যান চিরকাল সযত্নে লালন করবার মত একটি বিস্ময়কর উত্তরাধিকার। বর্তমান সময়ে ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে বহুভারতীয় নারী বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসবার পেছনে তিনি নিঃসন্দেহে এক বিরাট অনুপ্রেরণা। একদিকে যেমন একজন কট্টর নারীবাদী হিসেবে তিনি বিজ্ঞান-ক্ষেত্রের লিঙ্গ বৈষম্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং সেই লিঙ্গ ব্যবধান কমাতে কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, অন্যদিকে একজন সত্যিকারের বিজ্ঞানপ্রেমী হিসেবে নিরন্তর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করে গিয়েছেন। এই প্রতিভাময়ী বিজ্ঞান সাধিকা ক্যান্সার ও কুষ্ঠরোগকে নির্মূল করবার পথের সন্ধানে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, এবং ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানকে অব্যাহত রাখতে একটি অভিনব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসের পাতায় নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে খানিকটা নিভৃতচারিণী হলেও তিনি ছিলেন একজন বিপুল হৃদয়ের অধিকারিণী। তাঁর উদারতা এবং আতিথেয়তা ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর অমন বিস্ময়কর শিক্ষায়তনিক এবং সামাজিক অবদানগুলিকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অপ্রিয় হলেও সত্যি, আমরা তাঁকে ভুলে গিয়েছি। ভারতীয় ইতিহাসে আজ তিনি একটি বিস্মৃত অধ্যায়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর অপরিমেয় অবদান একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানের নিরঙ্কুশ জয়যাত্রাকে সকলের অগোচরে দিশা দেখিয়ে চলেছে।

লাল ফিতে সাদা মোজা খয়েরি পাড়ের শিলিগুড়ি গার্লস

রুমি বাগচী

আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে, ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে তো অবশ্যই... না জানি পৃথিবীর আরও কোনও প্রত্যন্ত দেশ থেকে নানা বয়সের নানা চেহারার নানা নামের মেয়েরা সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠান একসাথে উপভোগ করল। এই মেয়েরা এই মুহূর্তে বিশ্বের নানা শহরে থাকলেও তাঁদের সবার একটি যোগসূত্র রয়েছে, সেটি হল শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল।

এই মেয়েরা আজ কেউ মা, কেউ তরুণী বধূ, কেউ শ্বাশুড়ি, কেউ বা দিদিমা। কিন্তু তাঁরা সবাই কোনও না কোনও সময় শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলে পড়েছে। সবারই কিশোরীবেলাটা থেমে আছে এই স্কুলের মাঠে, এর চার দেওয়ালের মধ্যে।

এই স্কুলে পড়ার সময়ই কিশোর-যুবকদের চোখে পরা। যৌবনের সিংহদুয়ারের কাছে পৌঁছানোও এই স্কুলে পড়ার সময়ই। আর সিংহদুয়ারকে অভিষিক্ত করত সেই নওল কিশোর-যুবকেরা যাঁরা স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রেম নিবেদন করত। সেসব প্রেমের অকাল কুসুম ঝরে পরে গেছে, হয়ত। কিন্তু যাওয়ার আগে যৌবনকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

সেই শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের পঁচাত্তর বছর উদযাপনের প্রথম দিন, যেভাবে সবার উপস্থিতিতে জমকালোভাবে এই উদযাপন করার কথা ভাবা হয়েছিল, অতিমারীর জন্য সেটা সম্ভব হল না। তাই অল্প কিছু শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিয়ে সেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হল। শারীরিকভাবে অল্প কয়েকজন অংশ নিলেও, প্রযুক্তির সাহায্যে ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানসিক ভাবে জড়িয়ে ছিল ওই নানা দেশের মেয়েরা। একই সাথে সবাই একই অনুষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক পর্দার মধ্যে চোখ দিয়ে ছুঁয়েছে। তাঁদের মাঝে হাজার মাইল দূর থেকে

আমিও ছিলাম।

শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল ছিল শহরের গর্ব। সেই গর্ব তৈরি হয়েছিল এর পড়াশোনার রেজাল্ট-এর জন্য। খেলাধূলোতেও ছিল সেরা। কিন্তু এছাড়াও শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের ছিল আরেকটি জিনিস— আভিজাত্য। সেই আভিজাত্যের ছোঁয়া লেগে থাকত শাড়ির খয়েরি পাড়ের মধ্যে, লাল ফিতে আর সাদা মোজায়।

এই স্কুলকে ওই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রধান কান্ডারি ছিলেন অমিয়া সেনগুপ্ত। কিন্তু তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন আরও অনেক শিক্ষিকা। ঠিক আগের বছর এই স্কুলের একটি প্রাপ্তি হয়েছে — এই স্কুলেরই কৃতি ছাত্রী অত্যুহা বাগচী এই স্কুলের আজ প্রধান শিক্ষিকা।

অত্যুহা তখন অত্যুহা কুশারী। এই নামটি শুনলেই মনে পড়ে একটি ছোট্ট মিষ্টি পাতলা মেয়ে রিনরিনে গলার স্বরে আর আধো আধো উচ্চারণে কবিতা বলছে 'কাঠবিড়ালি! কাঠবিড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?/গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?/বিড়াল-বাচ্চা কুকুর-ছানা? তাও?/ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক, খাও একা পাও যেথায় যেটুক!...'

পড়াশোনা ছাড়াও আধো আধো স্বরে বলা এই কবিতায় সারা স্কুলে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল ও। সেই মেয়েটিই আজ এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। চেহারা, গলার সেই আধো স্বর দুটোই আজ অনেক অন্য রকম। অনেকগুলো স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে সে আজ শারীরিক ও মানসিকভাবে খুবই দৃঢ়। নির্বাচক কমিটি চিনতে ভুল করে নি। আশা করব, জীবনের সব অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিজের মেধা দিয়ে অত্যুহা আমাদের স্কুলকে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

এখন শহরে আরও কয়েকটি স্কুল হয়েছে। কিন্তু তবু শিলিগুড়ির ঐতিহ্য ও আভিজাত্যকে বহন করে চলেছে কিন্তু ওই লাল ইঁটের বিল্ডিংগুলো আর লোহার বিশাল গেটটাই। অতিমারী শেষ হওয়ার পর, দু'হাজার একুশের পুরো বছর ধরে এই পঁচাত্তর বছর পূর্তির উদযাপন চলবে। বিদেশ বিভুঁই থেকে আমরা অনেকেই আশা করছি যদি সব কিছু ঠিক হয়ে যায়, যদি তখন এই আনন্দ অনুষ্ঠানে পুরনো বন্ধুদের সাথে একটু হলেও উপস্থিত থাকতে পারি...।

প্রকাশিত হল

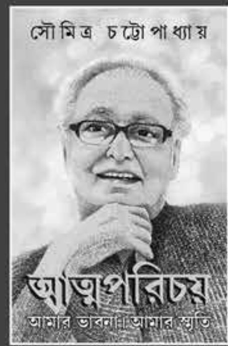

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মপরিচয় 395/-

'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ ক্বচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার

সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে

হায় সজনি

চূড়ান্ত রোম্যান্টিক উপন্যাস 199/-

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান: ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, হোম ডেলিভারি ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

পুরাণের নারী

কৈকেয়ী
এক ব্যর্থ নারীর কাহিনী

শাঁওলি দে

অযোধ্যার রাজা অজ ও ইন্দুমতির এক সুদর্শন পুত্র জন্মায়, নাম দশরথ। নারদের পারিজাত-পুষ্পমাল্য সজ্জিত বীণা ইন্দুমতির মাথায় পড়ে তাঁর মৃত্যু হলে, মনের দুঃখে রাজা অজও আত্মঘাতী হন। দশরথ তখন নেহাতই নাবালক। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ তখন নিজের সন্তানের মতই তাঁকে মানুষ করতে লাগলেন। এরপর দশরথ রাজা হলে তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই মহাপরাক্রমশালী খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। দশরথের প্রথম স্ত্রী ছিলেন কোশলরাজ কন্যা কৌশল্যা। কিন্তু অপুত্রক থাকায় দশরথ আবার বিবাহ করেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কৈকেয়ী। রাজা দশরথের আরও এক স্ত্রী ছিলেন সুমিত্রা নামে। তবে রাজার সবচাইতে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন এই কৈকেয়ী, এঁরই গর্ভজাত পুত্র হলেন ভরত।

রাণী কৈকেয়ীর জীবনের কথা জানতে হলে সবার আগে ওঁর জন্মকাহিনী জানা প্রয়োজন। চন্দ্রজিৎ-রাজকন্যা হৈমবতীকে মহর্ষি অগস্ত্য একবার অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁর ফলস্বরূপ হৈমবতী কৈকেয়রাজ অশ্বপতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বপতির প্রথম জীবনে কোনও সন্তান ছিল না। তিনি রাজপুরোহিতের আদেশানুসারে সাধুদের সেবা করতে যান এক ঋষির আশ্রমে। সেখানে তাঁর সেবা পেয়ে সাধুরা প্রীত হন এবং তিনি সূর্যদেবতার কাছে রাজা অশ্বপতির জন্য সন্তান বর চান। সূর্যের আশীর্বাদে রাজার যমজ এক ছেলে ও মেয়ে হয়। ছেলের নাম রাখা হয় যুধাজিৎ ও মেয়ে কৈকেয়ী। সাত ভাইয়ের একমাত্র আদুরে বোন কৈকেয়ী খুব ছোটবেলা থেকেই দাসী ও ধাত্রীমা মন্থরার কাছে মানুষ হন। এমনকী রাজা দশরথের সঙ্গে বিয়ের পরও কৈকেয়ীর সঙ্গে অযোধ্যায় যায় দাসী মন্থরা।

রাজা অশ্বপতি পাখিদের ভাষা বুঝতে পারতেন। কিন্তু শর্ত ছিল এই যে, কাউকে তিনি সেই ভাষার অর্থ বলতে পারবেন না। একবার রাজা ও তাঁর স্ত্রী বাগানে ভ্রমণ করছিলেন, সেখানে এক জোড়া রাজহাঁসের কথোপকথন শুনে রাজা হেসে ফেলেন, রাণী এতে খুবই কৌতুহলী হয়ে রাজাকে বারবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাণী জানতেন এই কথা শুনলেই রাজার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে। তবু তিনি শোনার জন্য বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন। রাণীর এই আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন রাজা অশ্বপতি। বুঝলেন তাঁর প্রতি স্ত্রীর তেমন কোনও ভালোবাসাই জন্মায় নি। তিনি রাগে স্ত্রীকে নির্বাসিত করলেন, তারপর কন্যা কৈকেয়ীকে তুলে দিলেন দাসী মন্থরার হাতে। মন্থরা ছিলেন এক কুব্জা দাসী, যে একাধারে বিকৃতকার, ঈর্ষাপরায়ণা ও কূটবুদ্ধিসম্পন্না। যদিও মন্থরা কৈকেয়ীর পরম শুভাকাঙ্খী, কন্যাসমা কৈকেয়ীর ভাল চাইতে গিয়ে মন্থরা তাঁকে কুবুদ্ধি দিয়ে নানাভাবে প্ররোচিত করেছিলেন রামের বিরুদ্ধে। মন্থরা সবসময় চাইতেন

কৈকেয়ী যেন রাজ্যে পাটরাণীর মর্যাদা পান।

রাজা দশরথের সঙ্গে একবার রাজা শম্বরাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই সময় দারুণভাবে আহত হন রাজা দশরথ। রাণী কৈকেয়ী সেই সময় দিনরাত সেবা করে রাজাকে সুস্থ করে তোলেন। দশরথ খুশি হয়ে দুটি বর দিতে চান প্রিয়তমা স্ত্রীকে। কিন্তু কৈকেয়ী বলেন সময় হলেই তিনি বর চেয়ে নেবেন। এরপর কয়েক বছর পর রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে (কৌশল্যাপুত্র) সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলে সকলেই খুব খুশি হন। রাজ পরিবারও খুশি, রাজ্যবাসীও। খবর পান রাজার তিন রাণীও। কৈকেয়ী অসম্ভব স্নেহ করতেন কৌশল্যা-পুত্র রামচন্দ্রকে। তাঁর রাজ্যাভিষেকের খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে দশরথকে বলেন, 'রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষ্যে। তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ রাজা রামং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি।' এর অর্থ রাম বা ভরতে কৈকেয়ী কোনও প্রভেদ করেন না। রামের রাজ্যাভিষেকের খবরে তিনি খুশি।

কিন্তু এই খবরে মন্থরা খুশি হন না। তাঁর মনে হয় রাম রাজ্যে বসলে রামের মা কৌশল্যাই কৈকেয়ীর চাইতে বেশি গুরুত্ব পাবেন। তাই মন্থরা নানাভাবে কৈকেয়ীকে কুবুদ্ধি দিতে থাকেন। প্রথমে না মানলেও পরবর্তীতে কৈকেয়ী প্ররোচিত হন ও রামের রাজ্যাভিষেকের কিছু আগে দশরথের কাছে সেই দুটি বর চেয়ে বসেন। তিনি প্রথম বরে তাঁর নিজের ছেলে ভরতকে সিংহাসনে বসার কথা বলেন ও দ্বিতীয় বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

এরপরের ঘটনা খুব ছোট কিন্তু দুঃখের। রাম বনবাসে গেলে দশরথ অসুস্থ হয়ে মারা যান। ভরত সব ঘটনা জানতে পেরে নিজের মাকে তিরস্কার করেন এবং রামের খোঁজে বের হন। মন্থরাও ভরতের হাতে শাস্তি পান। কৈকেয়ী শেষ বয়সে সব পেয়েও হারিয়ে ফেলেন মুহূর্তেই। রাম বনবাসের সময়কাল কাটিয়ে ফিরলে তিনি রামের কাছে ক্ষমাও চান।

কৈকেয়ীর চরিত্র আঁকতে গিয়ে বাল্মিকী অনেকগুলো রঙের মিশেল ঘটান। একাধারে তিনি সুন্দরী, রাজার সব চাইতে প্রিয় ও মিষ্টভাষিনী, অন্যধারে যুদ্ধে পারদর্শী, সাহসী এক নারী। দশরথের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যেমন রথ চালনা করেন, তেমনি আবার রথের চাকা ভেঙে গেলে শত্রু যখন একেবারে কাছে এসে যায়, কৈকেয়ী প্রত্যুৎপন্নমতিতার সঙ্গে চাকা ঠিক করে রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে যান। কৈকেয়ীর চরিত্রের নরম দিকটি হঠাৎই যেন পালটে যায় রামের রাজা হওয়ার খবরে। কিন্তু তিনি সবটাই করেন তাঁর ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, মন্থরার মত নিজের মর্যাদা বাড়ার কথা তিনি কখনও বলেন নি।

রামায়ণে কৈকেয়ীকে আমরা খলনায়িকা হিসেবেই দেখি। যদিও কৈকেয়ীর মাধ্যমে রামের বনবাসের ঘটনা না ঘটলে আদৌ রামায়ণ রচিত হত কিনা জানা

কৈকেয়ীর চরিত্র আঁকতে গিয়ে বাল্মিকী অনেকগুলো রঙের মিশেল ঘটান। একাধারে তিনি সুন্দরী, রাজার সব চাইতে প্রিয় ও মিষ্টভাষিনী, অন্যধারে যুদ্ধে পারদর্শী, সাহসী এক নারী। দশরথের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যেমন রথ চালনা করেন, তেমনি আবার রথের চাকা ভেঙে গেলে শত্রু যখন একেবারে কাছে এসে যায়, কৈকেয়ী প্রত্যুৎপন্নমতিতার সঙ্গে চাকা ঠিক করে রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে যান।

নেই কারোরই। তবু একথা বলতেই হয় কেউ কেউ জন্মসূত্রে খারাপ, কেউ বা কর্মসূত্রে। কিন্তু কৈকেয়ী প্রিয় দাসী মন্থরা দ্বারা প্ররোচিত হয়েই কুকর্মটি করেছিলেন এবং তাঁর ফল তিনি আজীবন ভোগ করেন। স্বামীর মৃত্যুর জন্যও যেমন তিনি দায়ী, ভরতও তাঁকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারেন নি, আর কোনওদিন তাঁকে মা বলে ডাকেন নি ভরত। আর ঠিক এই কারণেই কৈকেয়ীর মত সর্বগুণসম্পন্না এক নারীর জীবন ব্যর্থতার কালো ছায়ায় ঢেকে থাকে চিরকাল।

ডুয়ার্স ইত্যাদি। হরেক মাল দশ টাকা

প্রেয়ার লাইন

দেবায়ন চৌধুরী

জনগণমন এক হওয়া যে খুব কঠিন প্রেয়ার লাইন ছাড়া আর কে বোঝাবে? প্রেয়ারের আগে না পৌঁছুলে সারাদিন অপরাধবোধে ভুগতে হত। দেরির কারণের চেয়ে বেশি কাজ করত সবে মিলে কিছু করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়। প্রেয়ার শুরু হবার একটু আগেই স্কুলের বড় গেট বন্ধ হয়ে যেত। কোনও ভাবে ছোট গেট দিয়ে আমি নিজে যদিও বা ঢুকলাম, কিন্তু আমার সাইকেল? সে তো হিরো রয়্যাল...

অমুকবাবু মুখে বাঁশি নিয়ে লাইন ঠিক করতেন। আমাদের মধ্যে সমান দূরত্ব থাকার কথা, কিন্তু তা কি হয়? হয় না বলেই কলারের ভেতরে চিরকুট ঢুকিয়ে দেওয়া। হাসাস নাতো, খোঁচা দিস না, দেখাব মজা ইত্যাদি কথাবার্তা। সামনের বন্ধুর পিঠের ওপর আঙুল দিয়ে এমনি এমনি লিখতাম, সেই ছোঁয়াচে ধরতে হত কী লেখা হল। এত পিছুটান নিয়ে প্রেয়ার হয়! একদল যখন হিমাচলে আর একদল বঙ্গে। আর কতবার যে বলা হয়েছে তবু যমুনার গঙ্গা... রাস মেলায় গঙ্গা যমুনা আসতো, আমরা টিকিট কেটে দেখতে যেতাম।

কোন স্যার জাতীয় সঙ্গীতের সময় কী করেন আমাদের মুখস্থ ছিল। যেমন জানতাম হেডস্যার ছুটির ঘোষণা থাকলে কতবার হাত কচলান।

স্কুলে যেদিন পড়া ধরার কথা, সেদিন যদি শুনতে পেতাম— আজ এক মিনিট নীরবতা পালনের পর ছুটি হবে... বলা বাহুল্য সেই এক মিনিটকে এক জীবন মনে হত। তারপর খুশির ফড়িং দৌড়... আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...

আমাদের সাদা কালো ইউনিফর্মের দিন আজ ফ্রি সাইজ জামা পরে নিয়েছে। প্যান্টের ফোল্ড খুলে আর সেলাই করবার দরকার হবে না। আমাদের উচ্চতা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। নিয়তিও!

আমাদের সাবধান আছে, বিশ্রাম আছে। প্রেয়ার লাইন নেই।

বসন্তের হলদি বসন ও শাহী গোবি

এবার সরস্বতী পুজো ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, বেশ পিছিয়ে। সরস্বতী পুজোর সময় আর ভ্যালেনটাইন ডে কাছাকাছি পড়েছে এবারের ক্যালেনডার অনুযায়ী। তার পেছন পেছন বসন্তও এসে পড়ল। বাঙালির নিজস্ব ভ্যালেনটাইন আর পালিত ভ্যালেনটাইন সব মিলে মিশে একাকার।
তাই সবকিছুই একটু বেশি হলুদ একটু বেশি উজ্জ্বল।

শীতের জামাকাপড় আস্তে আস্তে আবার আলমারিতে বা খাটের বক্স-এ চালান হয়ে যাচ্ছে আবার বেশ কয়েক মাসের নামে। দেখতে দেখতেই শীতের শেষ আর বসন্তের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবার আগে আরও একটু রঙিন সাজপোশাক, আরেকটু ভালো মন্দ খাওয়াদাওয়া আর টুক করে ছোট ছোট ট্যুর করে ফেলতে হবে। শান্তিনিকেতন বা দার্জিলিং। বিষ্ণুপুর বা জলদাপাড়া। আমাদের কাছেপিঠে আছে অজস্র না দেখা জায়গা। যেগুলো যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং।

অফিস কাছারি তো খুলেই গেছে স্কুলও খুলতে শুরু করেছে। পরীক্ষাও এসে গেছে ছেলেপুলেদের। বসন্ত কিন্তু ক্ষণিকের অতিথি। দেখ না দেখ চৈতালি হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাবে বসন্তের লেবু ফুলের গন্ধ।

তারপর আসছে দোল। আর সবার মতই আমার কাছে বসন্তের রঙ হলুদ। বসন্ত পঞ্চমীর হলুদের মাঝে দোলের হাজারো রঙ মিলে মিশে একাকার।

হালকা তাঁত বা সুতির শাড়ির সঙ্গে মানানসই সাজগোজ আমার পছন্দ। সাজগোজ কখনই যেন এমন না হয় যা তোমার ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে যায়। সাজগোজ হবে এমন যেটা তোমার ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে তোলে। তাই বসন্ত উৎসবের এই সব দিনে হালকা হলুদ বা সাদা শাড়ি বা পোশাকই আমার পছন্দ। সঙ্গে মাটি বা ফুলের গয়না।

শীতের সবজি এখন শেষ পর্যায়ে। শেষ বাজারে তাই একটা ফুলকপির রেসিপি দিয়ে রাখি যেটা যে কোনও আমিষ খাবারকে টেক্কা দিতে পারে। এর জন্য ছোট্ট ফুলকপি নিতে হবে। আর একান্তই না পাওয়া গেলে বড় কপির থেকে ফুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে ফুটন্ত নুন গরমজলে ভাপিয়ে নিতে হবে সামান্য। এরপর গোল কড়াতে একটু বেশি তেলে কিছুটা পেঁয়াজের বেরেস্তা করে নিতে হবে। কপিগুলো হালকা লালচে করে ভেজে নিতে হবে ওই তেলেই। একটা পেঁয়াজ সেদ্ধ করে তাতে এক-দু কোয়া রসুন, সামান্য আদা, গোটা কয়েক কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো দিয়ে পেস্ট করে নিতে হবে। আগে থেকে পোস্ত, সাদা তিল আর ক'টা কাজুবাদাম ভিজিয়ে রেখে সেটাও বেটে নিতে হবে। এবার তেল আর ঘি একসাথে মিশিয়ে তাতে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ-এর পেস্ট দিয়ে কষাতে হবে। এরপর নুন, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরী লঙ্কার গুঁড়ো আর ধনেগুঁড়ো দিতে হবে।

তারপর ফুলকপি দিয়ে প্রয়োজন মত জল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সামান্য পরে কাজুবাদাম বাটা দিয়ে ঢেকে ঢাকনা দিয়ে মিনিট কয়েক রান্না করলেই হয়ে যাবে। তেল ভেসে উঠবে। রঙটিও খুব সুন্দর হবে। নামানোর আগে গরমমশলা গুঁড়ো, আর ধনেপাতা কুচি আর আগে ভেজে রাখা বেরেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে। পোলাও বা রুটি পরোটার সাথে জমে যাবে 'শাহি গোবি'।

পাতা মিত্র

ছবি উওম্যানিয়া (দোলা গুহনিয়োগী) র সৌজন্যে

EKHON DUARS, Vol-7, Issue-6 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

রোজনামচা। তপন রায় প্রধান। ১৯৫ টাকা
তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

পঞ্চাশে ৫০। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

বিসমিল্লার সানাই চৌরাশিয়ার বাঁশি। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাঙ্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.